ইয়োরোপ



শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই. সি. এস্.

সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং

১৫, কলেজ স্কোয়ার

কলিকাতা।

প্রকাশক—বলাই সেন
সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

এক টাকা
—।।

তাপসী প্রেস
৩০, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীগঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

—তোমাকে—

নিবেদন

ছাত্রাবস্থায় ইয়োরোপ-প্রবাসের সময়ের লেখা ব্যক্তিগত চিঠিগুলি অবলম্বন করে লিখিত এই প্রবন্ধ কয়টী প্রায় তিন বছর আগে বিভিন্ন সময়ে 'প্রবাসী' ও 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। তার ফলে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে ব্যস্ত ও বিধ্বস্ত ইয়োরোপের চিত্র এই বইয়ে নেই যদিও এই যুদ্ধের সম্ভাবনার কথা কোথাও কোথাও উল্লেখ করা আছে।

আসামের শ্যাম শৈলমালার ছায়ায় নির্জ্জন তাঁবুতে বা দুর্গম গ্রামে বসে কর্ম্মজীবনের ফাঁকে ফাঁকে এই প্রবন্ধগুলি লিখবার সময় বহু আদিম জাতির জীবনযাত্রা দেখতে দেখতে স্মৃতির পটে আঁকা আধুনিক সভ্যজাতির চিত্রগুলির মধ্যে প্রায়ই ফিরে গিয়েছি। তাই ভিন্ন পারিপার্শ্বিক ও সময়ের ব্যবধান প্রথম ভাবধারা ও অনুভূতিকে ব্যাহত করেছে বলে মনে করি না।

যে ইয়োরোপ লোপ পেয়ে যাচ্ছে এবং যাকে যুদ্ধবিরতির পর পুনর্গঠন করলেও আগেকার রূপ হয়ত দেওয়া যাবে না কেবল তারই চিত্র হিসাবে এই প্রবন্ধগুলির সার্থকতা হতে পারে। আমার মত বহু কল্পনাপ্রবণ ছাত্রের কৈশোর স্বপ্নের তীর্থ ভগ্ন, ভূলুণ্ঠিত ও শান্তির সুখস্বর্গচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। এর পরে যারা ইয়োরোপে যাবেন, তারা অতীত ও পুরাতনের চিত্র ও কাহিনী ভ্রমণকারীর গাইডবুকে পাবেন, কিন্তু হয়ত যা পাবেন না তার ক্ষীণ ও অসম্পূর্ণ

হলেও আন্তরিক পরিচয়ের আভাসও যদি দিতে পেরে থাকি তবে নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করব। ইয়োরোপে আমি বিদেশে প্রবাস করছি বলে কখনো মনে করতে চাই নি; মানসলোকে বিহার করতে চেয়েছি। তার সঙ্গে যে স্মৃতি ও শ্রদ্ধা বিজড়িত আছে তার প্রকাশের বিফল প্রয়াস করতে চাই না।

প্রত্যাবর্ত্তনের পর থেকে সর্ব্বদা বাংলা দেশের বাহিরেই কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে কাটাচ্ছি। বহু অবাঞ্ছিত ত্রুটি ও মুদ্রাকর-প্রমাদ এই পুস্তকে রয়ে গেছে। তবু যে এটি প্রকাশিত হতে পেরেছে সেজন্য আমার ছাত্রজীবনের শিক্ষক শ্রীজগৎতারণ দাস মহাশয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ।

সিমলা শৈল, আশ্বিন, ১৩৪৭

ইয়োরোপা

১

মনের মধ্যে সুদূরের জন্য দোলা লাগিয়ে ইংলণ্ডের অপরূপ ঋতু-উৎসব পরীক্ষার্থীর জানালার সামনে দিয়ে শোভাযাত্রার মত মাসের পর মাস চলে গিয়েছে। প্রথম বসন্তস্পর্শের ভীরু উল্লাসের মধ্যে ফিরতে চেয়েছি। গাছে গাছে ফুলের আভাস, ভবিষ্যতের সম্ভাবনার সূচনা খুঁজে পাবার জন্য, সোয়ালো পাখীর ফিরে আসার জন্য, সী-গালের জল-কেলির জন্য, আমার জানালার সামনের বার্চ্‌গাছের পাতায় পাতায় বর্ণপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্ল্যাকবার্ডের আগমনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রেখেছি। ভোরের স্কাইলার্কের আহ্বানটি শুনতে একদিনও ভুল হয়নি; স্নোড্রপ ও ক্রোকাসের সহসা বিকাশের সন্ধান বাদ দিতে একদিনও ইচ্ছা হয়নি।

আজ ছুটি, ছুটি! মনে মনে যে বসন্ত-ব্যাকুলতা এতদিন অনুভব করেছি তার আজ বন্ধনমুক্তি হবে। কাজের বাধা যেন দূর হয়ে গেল—তা সে যেমন করেই যাক্ না কেন—একটা ঝড়ে উড়ে যাক্ বা বৃষ্টিতে ধুয়ে যাক্—আর আমি অনির্দ্দিষ্ট পথে বের হয়ে যাই। আজ থেকে আমার ছুটি কাটাব কেমন করে? ছু'পাশের লতাগুল্মের 'হেজে'র বেড়ার পাশ দিয়ে ছায়া-সুনিবিড় গ্রামপথে হাঁটতে হাঁটতে কখন মৃদু-কম্পিত ভায়োলেটের শেষ স্পর্শটুকু পাওয়া যাবে, কখন বা দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর দিনগুলির উত্তাপে লাইলাক ও ল্যাবার্ণাম্ বিকশিত হয়ে উঠবে, সেই খবর নিতে নিতে কোথায় আজ যাত্রা করব? 'সারে'র নিভৃত, নিদ্রামগ্ন, নাইটিঙ্গেলমুখরিত নদীতীরে? সাসেক্সের সানুদেশের স্নিগ্ধ হরিৎ প্রান্তরে?

এই দেশকে একদিনের জন্যও নূতন বা অপরিচিত মনে হল না। আমার বহুদিনের কল্পনার শ্যামল গ্রামটি—টমাস হার্ডির গ্রাম, চেরী-ম্যাপ্‌ল্‌-পপ্‌লারে সুন্দর লীলাচঞ্চল হাস্যময় মে-উৎসবের গ্রামটির চিত্রের সঙ্গে ইংলণ্ডের গ্রামগুলি যেন মিশে রয়েছে। সাহিত্যের পাতায় এই ইংলণ্ডের গ্রামের সঙ্গে পরিচয় ছিল, যেখানে রৌদ্রের দীপ্তি আছে—দাহ নেই, প্রকৃতির উল্লাস আছে—উন্মত্ততা নেই, যেখানে কৃষকবালকের মত গর্সের সৌরভে আমোদিত প্রান্তরে গাছের ছায়ায় শুয়ে সুমধুর আলস্যে গুন্‌ গুন্‌ করে গান করা যাবে

Lying in the hay all day

I feel as lazy as the hazy summer day—

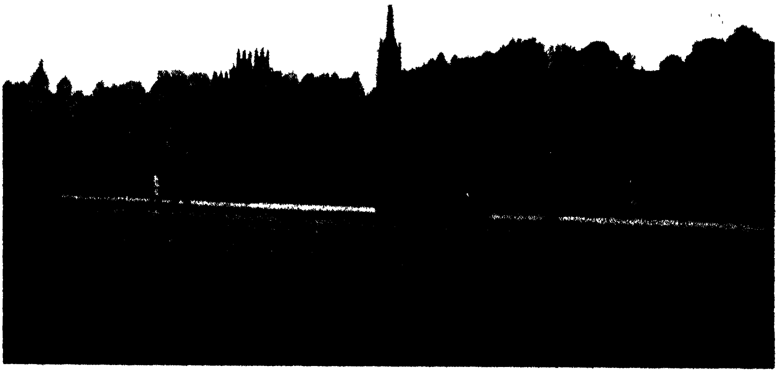
যেখানে শীতের শেষে বসন্তের চুম্বন-পুলকে প্রকৃতি যখন পরিণত শোভায় মধুর হয়ে উঠেছে, সেই সময় চার্লস ল্যাম্বের মত দিনের প্রসন্ন আলোকের উত্তাপে অনুভব করব—I feel ripening with the orangery.

শরৎকালের বন্ধনমুক্ত মন লণ্ডনে আর পড়ে থাকতে চাইল না। এই সময়েই প্রাচীন ভারতের রাজারা দিগ্বিজয়ে বের হতেন। আমার মনও ইয়োরোপের সব দেশে তার বল্গা ছেড়ে দিয়ে ছুটতে চাইল। চঞ্চল হয়ে উঠলাম, যেখানে খুশি চলে যাব—যত দূরে খুশি যাব—যেখানে আমার এই পারিপার্শ্বিক অবস্থা থাকবে না, চেনা লোক থাকবে না, আর থাকবে না ইয়োরোপীয় সতর্ক সময়নিষ্ঠা ও সুকঠিন আচারশীলতা।

একদিন সন্ধ্যাবেলা "ইয়ুথ হোষ্টেল এ্যাসোসিয়েশনের" তিনটি নূতন সভ্য আমরা পিঠে-বাঁধা 'রুকস্যাকে' বোঝাই জামাকাপড় ও অন্যান্য জিনিষপত্র নিয়ে এডিনবরার অতুলনীয় রাজপথ প্রিন্সেস ষ্ট্রীট বেয়ে উঠতে লাগলাম। লণ্ডন থেকে মাত্র ক'ঘণ্টার পাড়ি, তা ছাড়া এত বড় শহর; তবু প্রিন্সেস ষ্ট্রীট থেকে এডিনবরার গিরিদুর্গ দেখে মনে হতে লাগল যেন এরি মধ্যে আমার অরণ্যবাস আরম্ভ হয়ে গেছে। জনারণ্যের

মধ্যেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এই দুর্গ—এই ত বৈচিত্র্যের আরম্ভ। সঙ্গে সঙ্গে মনে আসে, এই শহরের উপকণ্ঠেই রাণী মেরীর হলিরুড প্রাসাদ। ভাবতেই মন কি রকম চঞ্চল হয়ে ওঠে!

এডিনবরায় আড্ডা নিয়ে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের সীমান্তদেশে কিছু ঘোরা গেল। এই সীমান্তকে স্কটের দেশ বলতে পারা যায়; কারণ



এডিনবরার গিরিদুর্গ

স্কটের লেখনীই এই জায়গাকে এত বিচিত্র, রোমাঞ্চকর ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। স্কটের বর্ণনায় যে দেশ পাই, যে দৃশ্য পাই, তা এখনো অটুট আছে; শুধু নেই সে অদ্ভুত যুগের লোকগুলি। মেলরোজ অ্যাবির ভগ্নস্তূপ এখনো দাঁড়িয়ে আছে; 'শেষ চারণের গানে' জ্যোৎস্নায় একে যেমন সুন্দর দেখাত বলে বর্ণনা আছে তেমনি সুন্দর ম্লান মহিমায় এই ভগ্নস্তূপ এখনো আছে; কিন্তু মায়াবী মাইকেল স্কটকে আর পাওয়া যাবে না। চেভিয়ট হিল্সের নদীগুলি বর্ষায় এখনো 'চেষ্টনাট' রং-এর

ফেনায় আকুল হয়ে ওঠে, কিন্তু তার মধ্যে কোন যাদুকরের মন্ত্র মিশানো নেই। ট্রসাক্স্ হ্রদের শান্ত সৌন্দর্য্যের মধ্য থেকে হঠাৎ কোন অলৌকিক সুন্দরী আজ কি আবার উঠে আসতে পারে? নাই পারুক,—তা বলে স্কটের দেশ, বার্ণ্সের দেশ আগেকার চেয়ে কম সুন্দর বলে মনে হল না। কিন্তু আমার গন্তব্যস্থল ত এখানে শেষ হয়ে যায়নি। সভ্যতার বাইরে হাইল্যাণ্ডসের জনপ্রাণিহীন পর্ব্বতের মধ্যে আমায় যেতে হবে, যেখানে পর্ব্বতবেষ্টিত হ্রদগুলির নীরবতার দিকে আকাশ নির্নিমেষনয়নে চেয়ে থাকে, আর অতলান্ত মহাসাগর এসে তাদের ডাক দিয়ে যায়।

মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্। আমাদের ট্রেণ গ্রাম্পিয়ান শৈলমালার তলা দিয়ে চলেছে। পথে কত ঝরণার শোভা, কত হেদারের মৃদু অস্পষ্ট গন্ধ। আর সমস্ত আকাশ ঘিরে বিখ্যাত ক্যালিডোনিয়ার মেঘের স্নিগ্ধ শোভা। মরুভূমিতে উটকে বলে দিতে হয় না সে কোথায় এসেছে। তেমনি হাইল্যাণ্ডসেও কাউকে বলে দিতে হবে না সে কোথায় এসেছে। এ দেশ যেন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে চিত্তকে স্পর্শ করে, নিজেকে অনুভব করিয়ে দেয়। আকাশে মেঘের ঘন নীলিমা, পাহাড়ে হেদারের ম্লান লালিমা, বন-হরিণের স্বেচ্ছাবিচরণ, তার উপর মেঘের গুরু গুরু ডমরু-রব। আপনি মনে জাগে কালিদাসের ঃ—

আষাঢ়সিক্তক্ষিতিবাষ্পযোগাৎ
কাদম্বমর্দ্ধোদ্গতকেশরং চ
স্নিগ্ধাশ্চ কেকাঃ শিখিনাম্—

এই হচ্ছে ইয়োরোপের 'জনস্থান'। সন্ধ্যাবেলা আখ্নাশেলাখ্ নামে একটি অজ্ঞাত ষ্টেশনে নেমে পড়লাম। এই নাম, বোধ হয়, এদেশের ভূগোলের পাতায় পাওয়া যাবে না। এই অভিযানের বর্ণনা দিবার জন্য কোন সংবাদপত্রের নিজস্ব সংবাদদাতাও সেখানে ছিল না। তার দরকারও ছিল না। সেকথা শীঘ্রই বুঝতে পেরেছিলাম।

ওই পথটি কাউকে রোমে নিয়ে যেতে পারবে না। শুধু যে পাহাড়টিতে নিয়ে যাবে সেখানে আছে অতন্দ্র নীরবতা, হেদারের বর্ণ-গরিমা আর বর্ষাসিক্ত 'পীট' মাটির একটা অবর্ণনীয় গন্ধ। একটা প্রাচীন অক্ষুণ্ণ শান্তির আভাস বুঝি ওইখানে আছে, তবু জানি যে, এইখানকার ভীষণ রমণীয়তার মধ্যে অতীত যুগের বিভিন্ন গোত্রের



পর্ব্বত পথে

(ক্ল্যান) হিংসা ও রক্তপাতের ইতিহাস ওই হেদারের রং-এর পিছনে লুকানো রয়েছে। পাহাড়ের কাঁধের উপর ঘুরে ঘুরে পথ উঠেছে, কিন্তু তার কোন বাঁকে অতর্কিতে কোন অতিথিপরায়ণ কুটীরের হনিসাক্‌ল বা হলিহকগুলি মাথা নেড়ে ক্লান্ত পথিককে বিশ্রামসন্ধানের জন্য আহ্বান করবে না। কোন সমুদ্রযাত্রাশ্রান্ত নাবিক পল্লীগাথার অনুসরণে এখানে কোন গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করতে পারবে না বা তার কাছ থেকে উত্তর

পাবে না, "হে শ্রান্ত নাবিক, আমার একটি রূপসী কন্যা আছে, তুমি যদি ভীষণ সমুদ্রে আর অভিযানে না যাও, তাহলে তাকে পাবে।" সেই পৌরাণিক গৃহস্বামী ও তার কন্যার অতিথিপরায়ণতা দূরে থাক্, চরণযুগল যখন অবসন্ন হয়ে উঠেছে, তখন ওই নির্জ্জন নিষ্করুণ পর্ব্বতে একটি অশ্বও পাওয়া যাবে না। মনে মনে বলতে থাকি—"হে পাদপদ্মযুগল, তোমরা ত আমার নও, আমার বুটদ্বয়ের; তবে আমাকে আর কষ্ট দাও কেন?"

সারাদিন পর্ব্বতারোহণের পর একটি "ইয়ুথ হোষ্টেলে" এসে পৌঁছানো গেল। এই হোষ্টেলগুলি ১৫।২০ মাইল দূরে দূরে কোন ঝরণা বা হ্রদ বা সমুদ্রের ধারে খোলা হয়েছে; কোন পুরাণো চাষার বাড়ী বা ধানের গোলাকে হোষ্টেল করা হয়েছে; তাতে দুটি শোবার ঘর, একটি ছেলেদের একটি মেয়েদের; খড়ের তোষক মাটীতে পাতা আর তিনটি করে কম্বল প্রত্যেকের জন্য আছে; শীত যে রকম সে হিসাবে শরীরের উপরে ও নীচে ভাগ করে কম্বল গায়ে দিতে হবে। নিজস্ব একটি ঘুমাবার বস্তায় শরীর ঢুকিয়ে দিয়ে খড়ের বালিশে মাথা দিয়ে সারাদিন পরিশ্রমের পর স্থখে ঘুমানো খুব সহজ ব্যাপার। একটি 'কমন রুম' আছে, সেখানেই উনান ও কাঠ আছে, কাজেই একাধারে রান্না ও আড্ডা চলে। নিজেই বাসন মেজে, কম্বল প্রভৃতি রোদে দিয়ে, ঘর পরিষ্কার করে পরের দিন ভোরে আবার যাত্রা করতে হবে। তিন রাত্রির বেশী এক হোষ্টেলে থাকা নিষিদ্ধ। খাবার জিনিষ সেখানেই কিনতে পাওয়া যায় কখনো কখনো—আলু, ডিম, দুধ, রুটী, মাখন ও টিনের জিনিষ; তবু ওগুলো নিজের পিঠের 'রুকস্যাকে' বয়ে নিয়ে চলাই স্থবিধা। প্রত্যেক হোষ্টেলে রাত্রিবাসের ও জিনিষপত্র ব্যবহারের জন্য একটি শিলিং মাত্র দক্ষিণা দিতে হয়। এই হোষ্টেল-সমিতি না থাকলে দুর্গম হাইল্যাণ্ডস্ সাধারণ লোকের কাছে অজ্ঞাত ও সত্যসত্যই অগম্য থেকে যেত। এখানে হোটেল বলতে কিছুই নেই—যা আছে তাও সম্ভ্রান্ত পল্লীতে এবং

সেখানে খরচ ইয়োরোপের দামী ও সভ্য হোটেলের চেয়ে বোধ হয় বেশী। কোন চাষা রাত্রে অতিথি রাখতে পারে না, কারণ জমিদারের কড়া নিষেধ। এখানকার জমিদাররা এ দেশকে সাধারণের পক্ষে নিষিদ্ধ শিকার-স্থানে পরিণত করেছেন; আমেরিকার লক্ষপতি ও ভারতবর্ষীয় মহারাজারা এদের অতিথি হয়ে, অবশ্য কাঞ্চনমূল্যে, আসেন হরিণ ও গ্রাউজ শিকারের জন্য। সেজন্য সাধারণ লোকের আগমন এখানে অবাঞ্ছনীয়, তাতে শিকার নষ্ট হয় ও আভিজাত্যের দাম কমে যায়।

এরা দেশকে ভালবাসে। দেশের প্রতি অজ্ঞাত কোণাটিকে আবিষ্কার করে, সুন্দর করে সাজিয়ে, বিদেশীকে দেখিয়ে এরা প্রশংসা পেতে চায়। এদেশে সৌন্দর্য্যচর্চ্চা লোকের অস্থিমজ্জাগত, সেজন্য কোন সুন্দর জিনিষকে এরা নষ্ট হতে দেবে না। এই যৌবনের দেশে শুধু মটরে বা ট্রেনে দেশ ঘুরে এরা সন্তুষ্ট নয়, পায়ে হেঁটে তন্ন তন্ন করে দেশকে জানতে চায়; সেজন্য কত জাতীয় সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়েছে! আর এই আনন্দ সকলেরই জন্য; যে দরিদ্র, যার ছুটি বৎসরে মাত্র জুনমাসের পনের দিন, সেও বেড়াতে যাবে; তার জন্য কোন হোটেল নাই বা থাকল! প্যারিসে ভিয়েনায় যদি সে নাই যেতে পারল, নিজের দেশের মুক্ত প্রান্তর পর্ব্বত অরণ্যানী তার জন্য রয়েছে; দেশের সমিতি তারও দাবী মিটাবার কথা ভুলে যায় নি।

সন্ধ্যাবেলা হোস্টেলের বারোয়ারী ঘরে এসে বসা গেল। নানারকম লোকের সঙ্গে আলাপ; এখানে জাত নেই, পাণ্ডিত্যের ভয় নেই, অর্থের আঘাতপ্রবণতা নেই। যার যতরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে, যার জীবনে যত মজার ঘটনা ঘটেছে সব বিনিময় হতে লাগল। এরা কেহ কাউকে আগে দেখেনি, কারো মত বা স্বভাবও জানে না; তবু প্রত্যেকের নিজের প্রকৃতির তীক্ষ্ণ কোণাগুলি ঘসে মেজে অপরের কাছে যাতে বিরূপ না হয় এমন ভাবে তৈরী করে নিতে হয়েছে। এইখানে ইউরোপীয় সামাজিক ভদ্রতার অকপট পরিচয় পাওয়া গেল। আমাদের মধ্যে সাধারণতঃ সত্যনিষ্ঠ আন্তরিকতার নামে যে

সমালোচনার প্রচলন আছে তার চেয়ে ঐ অকপট আলাপ-পরিচয় অনেক শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হয়।

নিত্যগতিশীল জীবন ইউরোপের। কে বা কাকে চেনে? অথচ এক দিনের দেখায় কত আলাপ হয়ে গেল; শহরের স্বল্পভাষিতা, গম্ভীরতা দূর করে সবাই আলাপ করতে লাগল। কারুর কোন পরিচয় আমাদের জানা নেই; কাল কাউকে চিনব না, তবুও আজকের জন্য আমরা কেহই যেন অপরিচিত নই। কারণ আনন্দের অংশীদার হতে কোন বাধা নেই, বিশেষতঃ সবারই উদ্দেশ্য যখন এক, পথ ভিন্ন হলেও। কে কোন্ পথে পাহাড় অতিক্রম করে এসেছে, কোথায় কোন্ দুর্লঙ্ঘ্য স্রোতস্বিনী আছে, তার বর্ণনার মধ্যে এক বৃদ্ধের সঙ্গে পরিচয় হল। ইনি সপরিবারে এসেছেন পদব্রজে। যৌবনে বিবাহের পর মধুমাস যাপন করবার জন্য যুগলে পদব্রজে হাইল্যাণ্ডসে এসেছিলেন; তখনকার দিনে ভিক্টোরিয়ার যুগেব সামাজিক বন্ধনের ফলে এদের বহু নিন্দা ও সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছিল। এখন বৃদ্ধ বয়সে সেই মধুমাস ঝালিয়ে নেবার জন্য আবার এখানে এসেছেন।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত গণিতের অধ্যাপক —র বুদ্ধি ও তারুণ্যের প্রশংসা করতে হবে। তাঁরই ছোট মেয়ে গোয়েন একটা টুলের উপর দাঁড়িয়ে ছেলেভুলানো মিষ্টি ছড়ায় বলছে যে, হোষ্টেলের বাইরের ঝরণাটাতে একটা পরী থাকে। আমরা সবাই সাব্যস্ত করলাম যে, সে নিজেই সেই পরী। আর তার ভাই ডেভিড—চেহারায় কিন্তু সে গলিয়াথের মত—কেউ তার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না দেখে ক্ষুণ্ণ-মনে এই পাহাড়ে কোন্ ক্ল্যান রাজত্ব করত তার ইতিহাস জানবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল। কে জানত যে, আমাদের সর্ব্বদা কাজ করে দিতে প্রস্তুত, বিনয়ী বন্ধু 'বিলের' মধ্যে এডিনবরার একজন উদীয়মান সলি-সিটার লুকিয়ে আছে? কেই বা জানত যে, যে চশমাপরা লোকটি তার

স্কচ্ কথা দিয়ে সবাইকে হাসাচ্ছে, সে হচ্ছে একটি ব্যাঙ্কার? এই বিচিত্র দলটির মধ্যে হঠাৎ নৃত্যচ্ছন্দে আবির্ভাব হল হাস্যমুখর তিনটি ডাণ্ডী শহরের মেয়ের। একটি, শ্রীমতী দণ্ডী, গান গেয়ে বলে উঠলেন যে, তিনি ডিম যোগাড় করতে পেরেছেন। তাজ্জব ব্যাপার! "আমরা কেহ কোথাও পেলাম না, তোমরা কি ক'রে পেলে হে।" কিছুক্ষণ পরিহাসের পর স্বীকারোক্তি হল যে, কাল যে ডিম পাড়বার সম্ভাবনা আছে সেগুলির জন্য আজ দাদন দিয়ে আসা হয়েছে!



হোষ্টেলের মাঠে গোয়েন ও দণ্ডায়মান। শ্রীমতী দণ্ডী

ইতিমধ্যে নানারকম পল্লী-সঙ্গীত আরম্ভ হল। সবাই তাতে যোগদান করল। তারপর একজন এডিনবরার ছাত্র তাদের কলেজের নূতনতম সেই "craze" গানটি ধরল, সে বলল, "ওহে আমাদের সাগরপারের বন্ধু, এই গানটা তোমার শোনা উচিত, কারণ নিশ্চয়ই এর মধ্যে তোমার হাত আছে,

My bonnie is over the ocean,
My bonnie is over the sea ;
Bring back, oh, bring back,
Bring back my bonnie to me."

আজকের এই হাইল্যাণ্ডসে অনেক পরিবর্ত্তন হচ্ছে। ভোরের 'গ্রাউজের' বা দ্বিপ্রহরের বনহরিণের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে কখনো বা মটরের হর্ণ এখানকার আদিম নিঃশব্দতা ভঙ্গ করে যায়। এখানে আজ যে 'কিল্ট' পড়ে বেড়াবে লোকে নিঃসন্দেহে বুঝবে যে, সেই হচ্ছে বিদেশী।

এখানকার সবগুলি পর্ব্বত ও হ্রদের উপর যেন একজনের সত্তা ও প্রভাব বিরাজ করছে। তিনি হচ্ছেন "বনি প্রিন্স চার্লি"। পৃথিবীর এই ভূখণ্ডের যত বীরত্বের গান, যত চারণ-গাথা সবই তাঁকে ঘিরে। এদেশের একটি বীর্য্যময় ও অত্যাচারিত যুগের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছেন চার্লি। আজো কোন বৃদ্ধ নাবিক ঝড়ে নৌকাডুবির আশঙ্কা হলে গেয়ে উঠবে তাঁর গান ; থেকে থেকে সে গানের ধুয়া সমস্ত আকাশে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরবে—"Will he na come back again ?" আর মানসপটে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় শিঙ্গাধ্বনি ও অগ্নি-সঙ্কেতের মধ্যে জেগে উঠবে একটি তরুণ প্রিয়দর্শন রাজপুত্রের পলায়মান চিত্র, যার মাথার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে ; অথচ যার রক্ষার জন্য ভীষণ নিশীথে বাত্যাবিক্ষুব্ধ জলরাশির উপর দিয়ে একটি বীর-বালিকা একাকিনী অভিযান করেছেন। অন্ধকার যখন হ্রদগুলির উপর ঘনিয়ে আসে, পাহাড়ের নীচে ছায়া যখন দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে মিলিয়ে যায়, তখন মনে হয়, ওই গানের ধুয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন অরণ্যান্তরালে 'বনি প্রিন্স চার্লি' এখনি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

স্কটল্যাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডের এক একটি যুগের কল্পনা ও পরিচয় এক একটি বিশেষ মূর্ত্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তাদের নামেই এরা ব্যবসা চালায়, তাদের কল্যাণেই এদের দিন চলে। যতদিন স্কটলণ্ড স্কটলণ্ড

থাকবে ততদিন স্কটের স্মৃতি একটি বিরাট্ সত্তার মত বিরাজ করবে। আর একটি মূর্ত্তি হচ্ছে গ্রাম্য কবি, গ্রামের প্রাণের কবি বার্ণসের। এ দেশের প্রেমিক-প্রেমিকারা চিঠি লিখবে বার্ণসের রচনা উদ্ধৃত করে,

"My heart is sair, I dair na' tell"

উপহার পাঠাবে হাইল্যাণ্ডসের ক্ল্যানদের (গোত্রের) পোষাক **tartan**এ বাঁধাই ছোট ছোট স্কট বা বার্ণসের বই, আর প্রিয়ার মুখের সঙ্গে তুলনা করবে রূপসী রাণী মেরীর। দেশের যেখানে যাই, ঘুরে ফিরে এদের ও রাজপুত্র চার্লির কথা উঠবে বা তাদের স্মৃতিচিহ্ন দেখানো হবে। হলিরুড



গ্রেট-বৃটেনের একটি প্রাচীন বাড়ি

প্রাসাদে গাইড এমনভাবে রিক্কিয়োর হত্যা-কাহিনীর বর্ণনা করবে, মেরীর শয়নকক্ষ দেখিয়ে দেবে, যেন তারা হচ্ছে মাত্র গতকালের বিদায়-নেওয়া বন্ধু ; সল্স্বারি ক্র্যাগের ওপাশ দিয়ে যেন পলায়মানা রাণীর অশ্বখুরের ধ্বনি এখনো সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায়নি।

ইতিমধ্যে আর একটি নূতন মূর্ত্তি এই জনবিরল ভূমিখণ্ডের শ্যাম অরণ্যানী ও অকরুণ পর্ব্বতমালার সামনে রূপ ধারণ করে উঠেছে।

"গ্রামে গ্রামে সেই বার্ত্তা রটি' গেল ক্রমে—"

মৈত্র মহাশয়ের মত এই ভারতীয়ের বিজ্ঞাপন চারিদিকে ছড়িয়ে যেতে লাগল। এজন্য কোন নিজস্ব সংবাদদাতার প্রয়োজন হল না; অথচ বাতাসের আগে আগে গ্রামে গ্রামে এই অভাবনীয় আবির্ভাবের সংবাদ পৌছে যেতে লাগল। একদিন দারুণ রৌদ্র উঠেছিল; টীনের খাদ্যদ্রব্য আর পোষাকে ভরা "রুকস্যাকের" ভারে প্রস্তরময় পর্ব্বতপথে প্রতিটি পদক্ষেপকে যন্ত্রণা মনে হচ্ছিল, আর সে পথের শেষ হবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। সে সময় পথশ্রম লাঘবের জন্য ও শ্রোতাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বাংলা কুচ-কাওয়াচের গানের নমুনা স্বরূপ

"চল্‌রে চল্‌রে চল্‌রে চল" ইত্যাদি

গাওয়া হয়েছিল। তার বিদেশী কথা ও বিচিত্র সুর গায়কের আগমনের আগে আগেই—বোধ হয় বেতার সহযোগে সব হোষ্টেলে পৌছে যেতে লাগল এবং প্রত্যেক পথচারী ও পর্ব্বতবাসীর অধরে একটু একটু অর্থপূর্ণ চাপা হাসিও যে খেলে গিয়েছিল সে রকম সন্দেহ করলে ভুল হবে না।

আর একবার জন্মতিথির উৎসব পালন করবার অসম্ভব সাধ মনে জেগে উঠল। মোটা চাল কোন রকমে মিলল বটে, কিন্তু ডালের অভাবে ভাঙ্গা ছোলার সন্ধান করতে বেশ একটু বেগ পেতে হয়েছিল। সমুদ্রের পার ধরে ধরে বাইশ মাইল হাঁটার পর এ্যাটলান্টিকের যে বন্দরে সপ্তাহে একদিন জাহাজ খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসে সেখানকার অমূল্য সবে-ধন-নীলমণি দোকানটিতে হাজির হয়ে দেখি যে, ম্যাক্রি সাহেবের ডাকঘর, জুতা-মেরামত ও মুদীখানার কাজ একই দোকানঘরে মহাসমারোহে সম্পন্ন হচ্ছে। সেখানকার জিনিষে যা রান্না হল তা অপূর্ব্ব। মশলাহীন, তেজপাতাহীন খিচুড়ীর পোড়া গন্ধ সমস্ত হাইল্যাণ্ডসের আকাশে বাতাসে ভেসে ভেসে ছড়িয়ে গেল। তিন দিন

পরে বন্ধুহীন বন্ধুর 'বেন টরিডনের' চূড়ায় বিশ্রাম করতে করতে যখন অপরাহ্ণ-সূর্য্যের আলোয় হেদারের বর্ণপরিবর্ত্তন দেখছি, রোয়ান গাছের শাখায় শাখায় যখন ফুলের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে, আর দিগ্বলয়ের বিলীয়মান রেখার এপারেই নীচের হ্রদটিতে একটা সান্ধ্য তন্দ্রার ভাব এরি মধ্যে নেমে আসছে, তখন দুটি কিশোরী স্মিতহাস্যে জানিয়ে দিল যে, তাদের দেশের এই নূতনতম রোমাঞ্চকর সংবাদটি তারাও অবগত আছে।

আর একদিন সমস্ত বেলা পাহাড় চড়াই করার পর নীচে নামবার পথে একটি ঝরণার পাশে ছায়ায় বসে রুটী, মাখন ও চিনি সহযোগে রাজকীয় 'লাঞ্চ' ভোজনের চেষ্টায় আছি, এমন সময় ঝোপের আড়াল থেকে একটা দীর্ঘকায়, বুদ্ধিদীপ্ত যুবকের মুখ দেখা গেল এবং সেই গাছপালার অন্তরাল থেকে এক সকৌতূহল প্রশ্ন বের হয়ে এল—"ওহে, তুমি কি সেই ভারতীয়"—প্রভৃতি। একটা জিনিষ ভারী ভাল লাগে। এদের চেয়ে-থাকার মধ্যে ঔৎসুক্য আছে, ঔদ্ধত্য নেই; প্রশ্নের মধ্যে সম্ভাষণা আছে, সন্দেহ নাই। এ ত তবু হাইল্যাণ্ডস্—যেখানে লোকে ইংরাজী বুঝে। ইয়োরোপের সর্ব্বত্র এই অতিথিপরায়ণতার ভাব পাওয়া যায়, বিশেষ করে স্পেন, জার্ম্মানী ও ইটালীতে। বিদেশীর মুখ যখন মূক হয়ে গেছে ভাষার অভাবে, মন সেখানে ভাবের আবেগে মুখর হয়ে উঠতে বাধা পায়নি; শব্দ যখন হার মেনে স্তব্ধ হয়ে গেছে, নীরবতার ভাষা সেখানে হাতের গতিতে, চাহনীর ভঙ্গীতে কাজ এগিয়ে দিয়েছে।

হাইল্যাণ্ডসের একটি বালিকা একাকিনী ধান কাটতে কাটতে গান গেয়ে ওয়ার্ডস্বার্থকে যে দ্বীপপুঞ্জের কথা ও তার সঙ্গে যে অকথিত বাণী, অগীত গান, অব্যক্ত ব্যথা ও অননুভবনীয় রিক্ততার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল, সেই দ্বীপপুঞ্জ এই যাযাবার বিদেশীকেও ডাক দিল। অতলান্ত মহাসাগরের কল্লোল ছাপিয়ে সেই অশ্রুত গানের আহ্বান এসে পৌছল।

কি অদ্ভুত দ্বীপ হচ্ছে এর 'স্কাই' (Skye) দ্বীপটা। মেঘ ও কুয়াসার ভিতর দিয়ে পথ হাতড়িয়ে এখানে পৌঁছিয়ে মনে হল যে, আরব্য-উপন্যাসের কোন এক রহস্যময়ী যাদুকরী এক সুন্দর নির্জ্জন বাগান তৈরী করে বাঁশীর ডাকে বিদেশীকে টেনে এনে সব অধিবাসীকে নিয়ে, বোধ হয়, আত্মগোপন করেছে। একাধিক সহস্র রজনীর একটি যেন কুয়াসার অন্ধকারে ঢেকে আমার সামনে উদয় হল।

পায়ের তলায় প্রস্তরবন্ধুর চড়াই; উপরে মেঘের চন্দ্রাতপ, সম্মুখে অদৃশ্য পর্ব্বতের ভিতর দিয়ে ১৭ মাইল অজ্ঞাত পথ। সে পথে দুটি গোত্রের মধ্যে একটা বিশ্বাসঘাতকতাময় ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল—যার ফলে একটা গোত্রের বংশে বাতি দিতে কেহ ছিল না। এপার থেকে তৃষিতনয়নে একবার হাইল্যাণ্ডসের দিকে ফিরে তাকালাম। এই কুহেলিকার আবরণের পরপারে যে একটি শ্যামল সরস দেশ আছে তা এখন কল্পনা করতেও মনে বাধতে লাগল। এপারের মেঘ ও রৌদ্রের খেলা, বারিধারার সিক্ততা ও "ক্যুলীন" পর্ব্বতের নগ্ন নিষ্ঠুর উষরতা ওপারের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেছে। ওপারে গ্রেটবৃটেনের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত বেন নেভিসের তলায় নদীকলধ্বনিত শ্যাম বনপথে চলতে চলতে কারো হয়ত মনেই হবে না যে, এপারে এমন একটা বিচিত্র দেশে নির্ম্মম প্রকৃতির লীলা চলছে।

৺ডি, এল, রায়ের নন্দলালকে মাঝে মাঝে মনে পড়ে। দেশের জন্য তার আত্মজীবন সযত্নে বাঁচিয়ে চলবার দরকার পড়েছিল; তাই সে কখনো কোন কষ্টসাধ্য কাজে হাত দেয়নি। "জীবনটা যদি দিই, না হয় দিলাম—কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কি?" তেলে-জলে মানুষ নিরীহ বাঙ্গালী হিন্দুর সন্তান নন্দলাল কেন ওই ক্যুলীন পর্ব্বতে জীবনসংশয় করতে যাবে। কিন্তু ইয়োরোপের হাওয়া, বোধ হয়, আমাদের সনাতন নন্দলালকেও ঘাড়ে ধরে নিরুদ্দেশের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য পথে বের করে আনতে পারবে। তা যদি পারে, তবেই ইয়োরোপের শিক্ষার ফল আমাদের ওপর ফলবে;

যুগধর্ম্মের সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে আমরা এগিয়ে চলতে পারব। বিদেশে এসে আমরা শুধু অনন্যমনে পরীক্ষা পাশ করে যাব, কূপের মধ্যে মণ্ডুকের মত যার সীমাবদ্ধ নিগড়বদ্ধ জীবন ছিল, সে আহার্য্য-অন্বেষণে পাখীর মত আকাশে উড়ে শুধু খড়-কুটা সংগ্রহ করেই ফিরে যাবে, ওই অসীম প্রসারের, মোহন নীলিমার একটুও আস্বাদ গ্রহণ করবে ন—একথায় কিছুতেই মন সায় দেয় না। সামনের ক্যুলীন পর্ব্বত নিষ্ঠুর ভয়াবহ বিপজ্জনক হতে পারে; তবু তার উপরও ত প্রাণ হাতে নিয়ে পায়ে কোমরে দড়ি বেঁধে লোক উঠছে; সে দৃশ্য দেখে বাইশ বৎসর বয়স পিছনে পড়ে থাকবে পরাজয়ের লজ্জা ও ব্যর্থতার গ্লানি স্বীকার করে—এ কি করে সহ্য করা যায়? হাইল্যাণ্ডসের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে 'লখ্ মারী' হ্রদের মাঝখানে একটি 'অপ্সরা দ্বীপ' আছে; সেখান থেকে ফিরবার সময় হঠাৎ



ক্যুলীনের পদতলে

কালবৈশাখীর মত উন্মত্ত ঝড়ে নৌকা ডুবে যাবার যোগাড় হয়েছিল, তখন আমরা উত্তাল তরঙ্গে অসহায় শিশুর মত ভেসে যাবার জন্য প্রস্তুত হইনি; অথবা ক্ষীণকণ্ঠে দুর্ব্বল ভাষায় ভগবানের নাম স্মরণ করে ক্ষান্তও হইনি। সেদিন আমরা কবি ক্যাম্বেলের 'লর্ড আলিনের কন্যা' কবিতাটি আবৃত্তি করে উৎসাহ সঞ্চার করেছিলাম; তারপরে ঠিক করলাম যে, এসো সবাই মিলে গান ধরা যাক। তখন বুঝতে পারলাম যে, জড়বাদ বস্তুবাদ প্রভৃতিতে মগ্ন থেকেও ইয়োরোপ কেমন করে নির্ব্বিবাদে জরাকে জয় করে, মৃত্যুকে উপেক্ষা করে বেঁচে থাকে। এদের আমাদের মত আধ্যাত্মিক সম্পদ্ নেই; তবু এরা আমাদের চেয়ে কত বেশী আনন্দ পেয়ে যাচ্ছে। সকলেরই জীবনের শেষ পরিণতি মৃত্যুতে; তবে কেন যে ক'দিন বেঁচে থাকব সে ক'দিন প্রাণের প্রাচুর্য্য থাকবে না? যে কখনো ভোগই করল না, তার ত্যাগের মহৎ দুঃখ লাভের সৌভাগ্য কোথায়? যে সংসারকে মলিন পুষ্করিণীর উপরের শৈবালদল সরিয়ে নীচের জলবিন্দু মাত্র গ্রহণের চেষ্টার মতন অসম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করল সে সংসারীর সন্ন্যাসে মহিমা কোথায়? যে আত্মনির্ভরশীলতায় সাহসে ত্যাগে আমরা দুঃখবিপদ্‌কে তুচ্ছ করতে পারতাম তা আমাদের নেই। আছে শুধু দুর্ব্বল কান্না। তাই জীবনকে দেখি অসহায়ের চোখ দিয়ে।

এমনই ইয়োরোপে মানুষের প্রকৃতি আপনা থেকে অকারণে সুদূর অনির্দ্দিষ্টের জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে; তার ওপর বহিঃপ্রকৃতি যখন অন্তঃপ্রকৃতিকে ডাক দেয় তখন মনে যে বিচিত্র লীলার আভাস পাই তার পরিচয় কি করে দেওয়া যায়? সারাটা দিন ক্যুলীন পর্ব্বতের সঙ্গে যুদ্ধ করে যখন নীচে নেমে আসছি, শ্রান্তির মধ্য দিয়েও একটুখানি জয়ের আনন্দ ফুটে উঠছে, আর বহুদূরে যেখানে রাত্রির জন্য আশ্রয় মিলবে সেই হোষ্টেলের অনাড়ম্বর আরাম ও বাহুল্যহীন বিলাসের কথাও মনে জেগে উঠছে, তখন নীচের ঝরণায় দুটি বালিকাকে বসে থাকতে দেখা গেল। কনককেশিনী তাদের কেশে বেশে মেঘমুক্ত একটি সূর্য্যরশ্মি এসে পড়েছে; তাদের নীল সরল চোখে তাদের

দেশের মেঘান্তরালের নীলনভস্তলের আভা যেন ধরা পড়েছে; আর মনে হচ্ছে যেন সমস্ত হেব্রিডিস দ্বীপপুঞ্জের আত্মার প্রতীক হয়ে বসে আছে তারা। একটি কথা আপনি মনে এল—'বিদেশিনী'।

এই বিদেশিনীকে ঘিরে কত কল্পনা, কত কাব্যরচনা, কত হৃদয়োচ্ছ্বাস! যার সন্ধানে রূপকথার রাজপুত্র পক্ষীরাজ ঘোড়ায় সাত-সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে ঘুরে বেড়ায় সে-ই বিদেশিনী। বৃক্ষলতার অনন্ত আনন্দমর্ম্মরে, শুভ্র অভ্রদলের লীলাকলায়, ঘনবনশয়নের শ্যামলিমায় যার আভাস পাই সে-ই বিদেশিনী। সে কিন্তু চিরকাল সকলের সন্ধানের অবসান ও প্রাপ্তির অতীত হয়েই রইল,— সে শুধু একটা আনন্দের কণিকা—যাকে অনুভব করা যাবে, স্পর্শ করা যাবে না, দেখা যাবে না। গোপন বলেই সে মধুর, নীরব বলেই তা'র জন্য কবির বাঁশী চিরন্তন মুখর, অপ্রকাশ বলেই তাকে প্রকাশ করবার জন্য ভুবন-ভরা এত আয়োজন। কিন্তু সে ত মানবের দেশের নয়, সে যে বিদেশিনী।

একটি উজ্জ্বল উত্তপ্ত দিন। 'লেক ডিষ্ট্রিক্টে'—ডারওয়েণ্ট ওয়াটার হ্রদের কাছে নিশ্চিন্ত হয়ে বেড়াচ্ছি। স্কাই দ্বীপের সেই পাগলামিভরা দিনগুলি অনেকটা পিছনে পড়ে রয়েছে। "গ্লেন ব্রিট্‌ল্‌" নামক জায়গায়—যেখানে অতলান্ত মহাসাগর ও নদী এক হয়ে বৃক্ষান্তরালে মিশে গিয়েছে তার পার ধরে ধরে সারাদিন কণ্টকলাঞ্ছিত জঙ্গলে 'ভাইকিং'-দের কবর খুঁজে বেড়ানোর উদ্দামতা এখন আর নিজের কাছেই অনুমোদিত হবে না। সেখানে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, প্রতি হ্রদে, পর্ব্বতে, গিরিগুহায় কোন না কোন যক্ষ বা প্রেতাত্মা বা ওই-রকম একটা কিছু আছে; প্রত্যেক জায়গার সঙ্গে উপদেবতার আবির্ভাব সম্বন্ধে গল্প জড়ানো আছে। আর প্রত্যেক লোকেরই নিজের বংশের সর্ব্বস্বত্বসংরক্ষিত ভূতের কাহিনীও পাওয়া যেত। সে সব রাত্রিতে সময় কাটাবার রোমাঞ্চকর উপায় ওয়ার্ডস্বার্থের

২

এলাকায় পাওয়া যাবে না। এখানে শুধু একটি মধুরপ্রকৃতি বালিকার আত্মা আছে, সে হচ্ছে পৃথিবীর তিলোত্তমা-বালিকা—কবির মানসসৃষ্টি লুসি গ্রে। লুসিকে পৃথিবীতে খুব কম লোকেই দেখেছিল; কিন্তু কবি তাকে যেভাবে দেখেছিলেন তা আমাদের কাছে অমর হয়ে আছে। লুসি যে আমাদের কাছে ধরা না দিয়ে অলক্ষ্যে পাহাড়ের ঝড়ের রাতে শিস দিয়ে দিয়ে নেচে নেচে বেড়ায় সে-কথা যে-কোন গ্রামবৃদ্ধা এখনো হলপ্ করে বলতে পারে।

হাইল্যাণ্ডসের সঙ্গে লেক ডিষ্ট্রিক্টের তফাৎ যে শুধু এইখানে তা নয়; তবে এ থেকেই প্রভেদের মূল সুরটুকু বুঝতে পারা যাবে। উত্তরাঞ্চলে প্রকৃতির মধ্যে পাই ভীষণ রমণীয়তা, এখানে পাই স্নিগ্ধ কমনীয়তা; সেখানে পাই আদিম জীবনের উল্লাস, এখানে মার্জ্জিত রুচির বিকাশ; সেখানে পেয়েছি আনন্দ, এখানে পেলাম পরিতৃপ্তি।

এই দু'টি অঞ্চলের দু'টি বিশেষত্বমূলক ইয়ূথ হোষ্টেলের সংলগ্ন প্রান্তর দেখলেই বুঝা যাবে। 'কেজিকে' কবি শান্ত স্নিগ্ধ যে-প্রকৃতিতে আনন্দ পেয়েছিলেন মানুষ সে-প্রকৃতিকে অপ্রাকৃত চেষ্টা দিয়ে সুন্দরতর ক'রে তুলেছে। উত্তরাঞ্চলে মানুষ গিয়েছে প্রাণের চঞ্চলতার বশবর্ত্তী হয়ে; তার পদচিহ্ন প্রকৃতি স্বহস্তে মুছে নিয়ে নিজ গম্ভীর মহিমায় লুপ্ত থাকবে।

এই হ্রদগুলির আশে পাশে যে-সব লোক বেড়াতে এসেছে তাদের মধ্যে অনেক ধনী বিলাসীও আছে। কিন্তু তাদের আমরা পথচারীর দল গণনার মধ্যেই আনি না। তারা হচ্ছে শান্তিভঙ্গকারী; নির্জ্জনতার পবিত্রতা তারা ধ্বংস করেছে। তাদের মটরগাড়ীর বহর ও হোটেলের ভোজন নিশ্চয়ই ওয়ার্ডস্বার্থের আত্মার অবমাননা করছে এবং গ্রাসমেয়ার হ্রদের রাজহংসটির জলকেলির সঙ্গেও সামঞ্জস্য রাখতে পারছে না, একথা মনে ক'রে সান্ত্বনা লাভ ক'রে হ্রদের মধ্যে নৌকা বাইতে নেমে পড়ি। তারা পারে দাঁড়িয়ে দেখে বা মটরলঞ্চে ঘুরে বেড়ায়। "উইনাণ্ডার" হ্রদের তীরবর্ত্তী

যে বালক পেচকধ্বনির অনুকরণের পরে গভীর নীরবতার মধ্যে, সহসা জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে প্রকৃতির বিরাট্ আহ্বানে হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত দেখতে পেয়েছিল তার মত সৌভাগ্য কোন-না-কোন দিন হয়ত পাব, আর ওই মোটরবিহারীর দলের মত কবির গৃহের দোকান থেকে একটি কবিতা-সঞ্চয়ন কিনে নিয়েই ফিরে যেতে হবে না। জীবনে পরমক্ষণ অতি দুর্ল্লভ, এবং অতি অপ্রত্যাশিতভাবেই তা আসে। তার জন্য অহরহ নিজেকে প্রস্তুত রাখব।

গ্রাসমেয়ারের হোষ্টেলে সেদিন রাত্রে মহা আনন্দ। একদল জার্ম্মান পথচারী ও পথচারিণী এসেছে; তারা নানা কলাবিদ্। ইংলণ্ডের মত দেশেও এরা নিজেদের অন্তরের গভীরতায়, উৎসাহের প্রাচুর্য্যে ও নিয়মানুবর্ত্তিতায় সকলকে চমৎকৃত করে দিল। রাত্রে তারা নানা ভাষায় কত গান গাইল, কত বিভিন্ন রসের ভাবের গান। দেখে মনে হয় যেন এরা এদের দেশের প্রতিনিধি হয়ে বিদেশে এসেছে। যেখানে যায় সৌজন্যে ও চরিত্রের বিশেষত্বে সকলের প্রশংসা অর্জ্জন করে। ইতিমধ্যে আরো গভীর রাত্রে একটা ব্যাপার হ'ল। অন্ধকার সিঁড়ির এক কোণা থেকে ধীরে ধীরে একটা অস্ফুট স্প্যানিশ গীতারের ধ্বনি উঠল; ধীরে ধীরে সে ধ্বনি উচ্চতর হ'ল ও তার সঙ্গে ইয়োরোপীয় 'টেনর' কণ্ঠে একটি ইটালীয় গান আরম্ভ হ'ল—"সোলো পারা তে লুসিয়া", লুসিয়া শুধু তোমারই জন্য। এই বিখ্যাত গানটি বর্ত্তমান ইটালীর শ্রেষ্ঠ গায়ক জিলি (Gigli) স্বয়ং রেকর্ডে গেয়েছেন; সে গান যেন সমস্ত হোষ্টেলটাকে মন্ত্রমুগ্ধের মত করে রাখ্‌ল। নিয়মমত রাত্রি ১১ টার পর কেহ শোবার ঘরের বাইরে আসতে পারবে না; কিন্তু আমরা সবাই সে নিয়ম ভঙ্গ করলাম। নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে অন্ধকারে একটি একটি মূর্ত্তি সমবেত হ'তে লাগ্‌ল। বিরাট্‌কায় অনুভবের চিহ্নমাত্রহীন মূর্ত্তি 'ওয়ার্ডেন' নিজে সেখানে এল, তার মুখে নিয়মভঙ্গের জন্য বিরক্তি বা ভর্ৎসনার চিহ্নও নেই; মুখে তার একটা আনন্দের উত্তেজনা, একটা তৃপ্তির

আভাস। সেই ইটালীয় গান নীরব নিশীথিনীর অন্তরের স্বরটি যেন আমাদের সামনে উদ্ঘাটন করে দিল।

তারপর দিন এখানকার সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত 'হেল্‌ভেলিনে' মহাসমারোহে আরোহণ করলাম। কিন্তু তার চূড়া থেকে ওয়ার্ডস্বার্থের দেশ দেখ্‌তে দেখ্‌তে পরিশ্রমের কথা একটুও মনে হল না। কার যেন স্নিগ্ধ হস্তের স্পর্শে সব ক্লান্তি সব গ্লানি মুছে গিয়েছে। রাত্রের গানের রেশটুকু বার বার মনে করিয়ে দিতে লাগল যে, ভাল লাগে, ভাল লাগে ইউরোপের এ আনন্দময়, উল্লাসময়, মুক্ত জীবন যা পায়ে পায়ে চ'লে দুঃখকে দূরে সরিয়ে রাখে, মৃত্যুকে উপেক্ষা করে—সে জীবন আমার ভাল লাগে। 'সোলো পারা তে', হে ইউরোপা।

২

সভ্যতার মধ্যে ফিরে এলাম। কিন্তু এ কোন্ লণ্ডন? যাকে রেখে গিয়েছিলাম, সেই পত্রপুষ্পভূষিতা উৎসবময়ী নগরীকে দেখতে পাচ্ছি না। বহুদিনের প্রোষিতভর্ত্তৃকার মত তার রূপ; তাকে আজ চিনে নিতে মনের মধ্যে একটা ব্যথা লাগে। যে পরিপূর্ণ যৌবনে তাকে দেখে গিয়েছিলাম সে পরিণত শোভা আর নেই; বসন্তসজ্জা তার একে একে খসে যাচ্ছে উৎসবের নিশান্তে দীপমালার মত।

আমাদের শরৎ আর ইউরোপের 'অটাম' ঠিক একরকম নয়, যেমন ভারতবর্ষের ও ইয়োরোপের ঋতুবিভাগ একরকম নয়। বরং অটামে হেমন্তকালের আভাস পাই। আমাদের শরতে মেঘের খেলা যা-কিছু আকাশে থাকে তা'র প্রকাশ ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'তে থাকে, আর লঘু সাদার ভিতর থেকে অম্লান মোহন নীলিমা ফুটে ওঠে। এদের শরতে আকাশটুকু ছোট হয়ে দেখা দেয়, দিনের আলো ক্ষীণ ও স্বল্পস্থায়ী হ'তে থাকে। তবু এদের

হেমন্তকালও কম প্রাণময় নয়। নাই বা থাকুক তার প্রথম বসন্তের মাধুর্য্য, পরিণত গ্রীষ্মের ঔজ্জ্বল্য। কখনো বৃষ্টি, কখনো মেঘ, কখনো কুয়াসা আসে, তবু বাতাসে একটা মৃদুভাব পাই। সূর্য্য এখনো চোখজুড়ানো আলো



পিকাডিলি

দেয়, হরিদ্রাভ পাতাগুলিকে কোমলভাবে স্পর্শ করে, পাছে রূঢ় স্পর্শে তা একদিন আগেই বা খসে যায়। অভিশপ্তা পাষাণীভূতা অহল্যার স্বপ্নঃদেখবার সময় এখনো প্রকৃতির আসে নি। এখনো যে—

"হাসে পরিচিত হাসি নিখিল সংসার।"

কিন্তু এ কোন্ আমিই বা লণ্ডনে ফিরে এলাম? সমস্ত মনটা নিজের অজ্ঞাতসারে বদলাতে বদলাতে যে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে তার হিসাব দিতে পারি না! প্রসন্ন আকাশের উদার নির্নিমেষ দৃষ্টি দিয়ে সব নিরীক্ষণ করতে চাই; সব কটি ইন্দ্রিয় সজাগ হ'য়ে ইয়োরোপকে পরিপূর্ণভাবে অনুভব করতে চাচ্ছে; পুরাতনকে পিছনে বিস্মরণের মধ্যে রেখে আসতে চায়, পাছে

পুরাতনের মায়ায় নূতনের ছায়াটুকুও বাদ দিয়ে যাই। আমার মন যেন ঘুমন্ত রাজকন্যার সন্ধানে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চ'ড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় এত দূর দেশান্তরে চলে এসেছে যে, আর পিছনে তাকিয়ে কিছুই দৃষ্টিগোচর হওয়া সহজ নয়।

এখনো আমার ছুটি ফুরিয়ে যায়নি; কিন্তু সংবৎসরে যারা পনের দিন মাত্র ছুটি পায় তারা সবাই যে-যার কাজে ফিরে এসেছে। তাদের দিকে কি আমি কৃপার দৃষ্টিতে তাকাব? যে দুই চোখ প্রথম থেকেই বিরাট্ বিস্ময়ে ও সহানুভূতিতে সমস্ত ভুবন পর্য্যবেক্ষণ করতে আরম্ভ



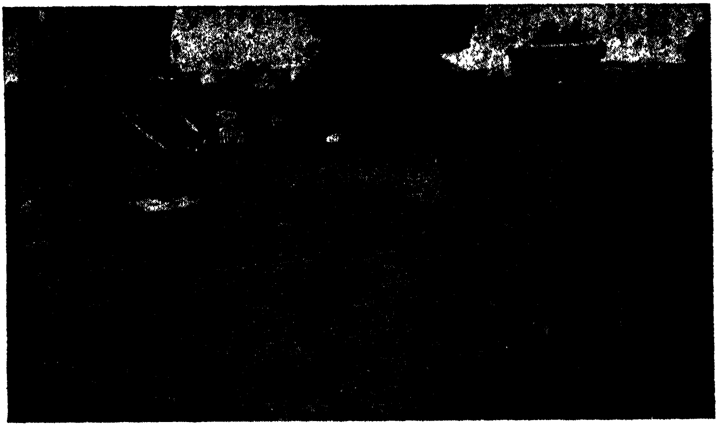
টেম্‌স্ থেকে পার্লামেণ্ট

করেছিল তারা এখনো একটুও ক্লান্ত হয়নি। বিদেশ যেন কোন রহস্যে-ভরা যাদুকরের ইন্দ্রজালের কাঠি ঠেকিয়ে তাকে মাধুরী দিয়ে রেখেছে; তাই দেখে দেখে পুরাতন হয় না। অতিভোরের চাকরাণীর কর্ম্মব্যস্ততা, দুধওয়ালার দ্বারে দ্বারে দুধ রেখে যাওয়া, কুলীমজুরের বাস বা আণ্ডার-গ্রাউণ্ডের পথে দৌড়ানোর মধ্য দিয়ে লণ্ডনের জাগরণের চিহ্ন পাই। তারপর দলে দলে লোক যে-যার কাজে যাবে—পুরুষ ও নারী, যুবক ও

বালক কত বিচিত্র সজ্জায় কত বিভিন্ন ভঙ্গীতে চলবে; কত দীর্ঘ ঋজু বীরের মত সুঠাম দেহ, চঞ্চল লীলায়িত ফুলের মত সুন্দর মুখের শোভাযাত্রা চলবে। তারি মধ্যে হয়ত কোন যুবক পথে একটি যুবতীর সঙ্গে মিলে একসঙ্গে যেতে লাগল, হয়ত দুজন বন্ধু বা এক আপিসের লোক। পথে যেতে যেতে চোখের হাসিতে মুখের কথায় ক্ষণিকের সাহচর্য্যে যেটুকু সুখ তা-ও এই কর্ম্মের আনন্দ-তীর্থের যাত্রীদল বাদ দিতে চায় না। জীবনে হয়ত এদের অনেকেরই অদৃষ্টে বিবাহ নেই, অন্ততঃ প্রথম জীবনে নেই; কিন্তু তবু কর্ম্মস্রোতে এরা পুরুষ ও নারী পাশাপাশি ভেসে চলেছে। পুরুষ নারীকে 'নরকস্য দ্বারং' বলে এড়িয়ে যায়নি; নারী পুরুষকে ভয়ের সামগ্রী বলে পিছিয়ে যায়নি; আর সমাজ দেয়নি এদের মধ্যে আগুন আর ঘির একটি মাত্র সম্বন্ধ নির্দ্দেশ ক'রে। স্ত্রী-পুরুষের সান্নিধ্যের ফলে রূপ, স্বাস্থ্য ও সামাজিক গুণের চর্চ্চা এদের মধ্যে মনের অগোচরেই বেড়ে গেছে। তার ফলে পুরুষের অহরহ সাধনা নারীর চোখে জনতার মধ্যে একটি জন হয়ে ওঠবার; নারীরও সেই সাধনা। তার ফলে পশ্চিমে মানবজাতিরই উন্নতি হয়েছে সর্ব্ববিধ। আমাদের মত ক্ষীণজীবী বা অসুন্দর হবার লজ্জা ও গ্লানি ইয়োরোপে দেখা যায় না।

কথা উঠেছে যে, বয়স মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রার রূপ কমিয়ে দিতে পারত না বা পরিচয়ের গ্লানি তার বহুমুখী আকর্ষণ নষ্ট করতে পারত না, কিন্তু তাকে এই সব শহরতলীর ছোট ছোট গৃহস্বামিনীর কাজ করতে হ'লে দু'টি বছরে তার রূপ ও আকর্ষণ সাফ হ'য়ে যেত। যে বেচারী ৪০০।৫০০ পাউণ্ড বছরে উপায় করে তার গৃহশ্রমে ক্লান্তা কান্তার কথা স্মরণ করে সবাই দুঃখ করছে। কিন্তু, আমি ত তার দুঃখের কারণ বুঝি না। যতদিন তার যৌবন আছে—এবং এদেশে যৌবন দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হচ্ছে—ততদিন সে একটি ঘর বা ফ্ল্যাট নিয়ে বেশ স্বাধীনভাবে থাকতে পারত বটে, কিন্তু তার জন্য স্থায়ী কিছু থাকত না। বরং তার স্বামীদেবতারই

ভাগ্য হয়ত খারাপ। সে যে আপিসে একটানা খাটে তার কোন ফল সে হাতে হাতে দেখাতে পায় না; কিন্তু গৃহিণী একটি গৃহ দেখাবে যা তার নিজের হাতের তৈরী, নিজের পরিকল্পনার ছাপ তাতে আছে সুরুচিসম্পন্ন সৌষ্ঠবের মধ্যে। ইলেক্‌ট্রিক আর গ্যাস তার পরিশ্রমকে লঘু ও ভদ্র ক'রে দিয়েছে। তবে তার দুঃখ কিসের? আসল কথা হচ্ছে যে. এ



বেদের আস্তানা

যুগে বাইরের জগৎ সবাইকে টানছে; ঘরমুখো কেহ নয়; পায়ে এদের বাঁধা আছে রথচক্র, মুখে বুলি—

"যাব না যাব না যাব না ঘরে,
বাহির করেছে পাগল মোরে।"

পদব্রজে বের হওয়া গেল। তা নাহলে আমার আজকের মানস ভ্রমণটুকু ব্যর্থ হবে। চলার প্রেমে মেতে জনস্রোতে ভেসে ভেসে গিয়েও নিজের উদ্দেশ্যের ঘাটে ভিড়তে হবে, তা না হ'লে আঁখির পিপাসা মেটেনা, মনের

অভিযান পূর্ণ হয় না। ভারতীয় ছাত্র ইংলণ্ডে এসে লণ্ডন দেখে না, দেখে কিন্তু প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনা। তার কারণ হচ্ছে কাছের গঙ্গা ঘাটের পানি। কলকাতার বাসন্দা কজনই বা গঙ্গাস্নানে যায় ?

কোথায় যেন পড়েছিলাম যে, লণ্ডনের আগে নাম ছিল 'ক্যাথিড্রালের শহর'। সে কথা আজ কেহ মানতে চাইবে না। রোম, সেভিল, কলোন ঘুরে এসেই যে মানুষ সে কথা অস্বীকার করেছে তা নয়, লণ্ডনের গায়ে আজকাল কোথাও একটু 'ক্যাথিড্রালে'র ছাপ খুঁজে পাওয়া যায় না। সেণ্ট-মার্টিন্‌স্, এমন কি সেণ্টপল্‌স্, কারই বা নজরে পড়বে ? লণ্ডনের বসতি-পল্লীর নাম-করা ছোট ছোট বানানগুলি পর্য্যন্ত আজকাল উৎসবের বেশ হারিয়ে ফেলেছে। ব্লুমস্‌ব্যবীর বাগান ত ইউনিভার্সিটিই গ্রাস করেছে। কাজের দাবীর সঙ্গে সৌন্দর্য্যের দাবীর একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছে। তার ওপরে লণ্ডন যেমন ভাবে ব্যবসায়ের দস্যুদের হাতে প'ড়ে বদলিয়ে যাচ্ছে তাতে এর স্বার্থবৃদ্ধি হচ্ছে বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যনাশও হচ্ছে। জগৎ-জোড়া ব্যবসার কল্যাণে লণ্ডন হয়েছে 'কসমোপোলিটান', কিন্তু কমনীয়তা কমেছে। এ নির্ম্মাণ-কৌশলের দৃষ্টান্ত, কিন্তু স্থপতির স্বপ্ন-সৃষ্টি নয়। তার বিলাস-লীলার কেন্দ্র পিকাডিলির সর্ব্বাঙ্গ লাল নীল বিজ্ঞানের দৌলতে বাঁধা পড়েছে, সেগুলি সৃষ্টি, কিন্তু সুরুচির চিহ্ন নয়। সে বিজ্ঞাপনের আলোর বাহার এমন কি Erosএর মূর্ত্তি থেকেও পথিকের প্রশংসমান দৃষ্টি সরিয়ে নিচ্ছে। লণ্ডন মহাশহর কিন্তু মহানগরী নয়; তার টেমস সীন বা দানিয়ুব নয়। ফ্লীট ষ্ট্রীট দিয়ে এগোতে সেণ্ট পল্‌স যে কোথায় দু'পাশের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অফিসের ছায়ায় চাপা প'ড়ে থাকে তা টেরই পাওয়া যায় না। নদীর পথ দিয়ে না এসে ভিক্টোরিয়া দিয়ে এসে ওয়েষ্টমিনিষ্টার এ্যাবি ও পার্লামেণ্টেরও প্রায় সেই দশা হয়। পৃথিবীময় বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের আওতায় এর ইতিহাস-ময় আভিজাত্য লোপ পেতে বসেছে।

তবু ভাল, যারা এ দস্যুতা করছে তাদেরও কিছু শিক্ষার অভাব নেই।

তারা যা বানাচ্ছে তাকে বড় জোর 'ভালগার' বলা যায়; কিন্তু তা ভাঙবার মত নয়। সেণ্ট পল্‌সের কাছেই যে বিরাট্ সাংবাদিক গৃহ উঠেছে তাকে সৌধ বলব না, কারণ তার মধ্যে না আছে সুধার সৌন্দর্য্য, না তার সাঙ্গোপাঙ্গ ইষ্টক বা প্রস্তর। বিরাট্ সরলরেখাময় কাচময় একটা দানব, কিন্তু আকর্ষণকর দানব মাথা তুলে উঠেছে। ব্রাইটনের একটা নূতন বাড়ীর কথা ধরা যাক। আগেকার টিউডর গৃহের অন্ধ অনুকরণ থেমে গেছে; তার স্থানে এসেছে



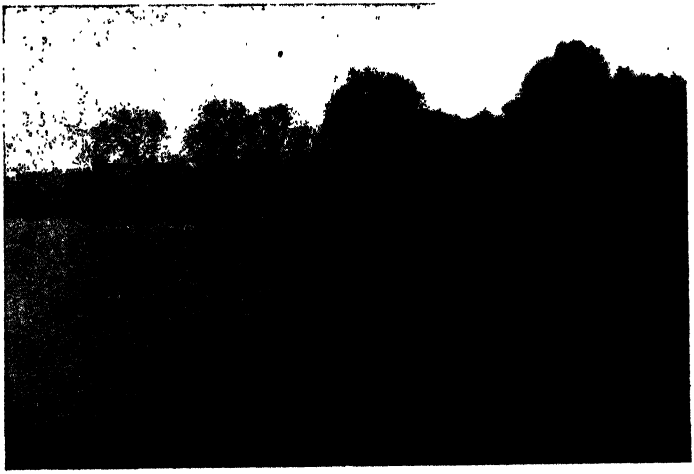
Folk-dancing

কোন জটিল কারুকার্য্য নয়, সরল সৌন্দর্য্য। এই হচ্ছে "ফিউচারিষ্ট আর্টের" মূলমন্ত্র। প্রাচীর হ'তে প্রাচীর পর্য্যন্ত কাচের জানালা চলে গেছে, ভিতর থকে মনে হয়-আকাশ ও সাগরের একটা বিরাট্ অংশ চোখকে ডাকছে। বাইরে থেকে এই জানালাগুলি একটার উপর একটা প্রতি তলে খিলানের মত চলে গেছে; রাত্রে সমান্তরালভাবে আলোর সারি দেখা যাবে। তাকে কিন্তু দীপমালা বল্‌ব না। এই জানালাগুলি কেবলি জানালা, বাতায়ন নয়, এই কাচও স্ফটিক নয়। এই শিল্পে সারল্য আছে, শালীনতা নেই; কৌশল আছে, কল্পনা নেই; আবশ্যকতা আছে, আভিজাত্য নেই।

ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ স্থপতির ভাবা কালের গ্রামের নিষ্ঠুর পরিকল্পনা হচ্ছে, গ্রামের চার্চ্চটির উপরেই তলায় তলায় প্রকাণ্ড ভাড়াটে ফ্ল্যাটের শ্রেণী; তারি মধ্যে থাকবে গ্রাম্যলোক আর তাদের বেতার, টেলিফোন ও ডাকঘর। বিল্ডিং সোসাইটিগুলির কল্যাণে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মটরগাড়ীর অহরহ আক্রমণে গ্রাম্য ইংলণ্ডের রূপ বদলাতে বাধ্য। তবু এখনো লণ্ডন ছেড়ে দূরে গেলেই গ্রাম না হোক গ্রামের অখণ্ড শ্যামলিমা ও অক্ষুণ্ণ শান্তি পাওয়া যায়; এমন কি, কোন কোন গ্রামে অপ্রত্যাশিতভাবে বেদের (জিপ্সি) আস্তানাও পাওয়া যায়। এই 'রোমানি' বংশকে গ্রাম্য ইংলণ্ডে একটুও বেমানান মনে হয় না। কোথাও বা পাই আগেকার সুন্দর সরল folk-dancing-এর উদাহরণ। গ্রামের লোক ও শহরের লোক মিলে পুরাতন সাধারণ লোকের আনন্দের জিনিষগুলি পুনর্জীবিত করছে। এই পুরাণো জিনিষকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস ভবিষ্যতের গ্রামেও থাকবে; কিন্তু হয়ত থাকবে না তার মধ্যে প্রাণ, থাকবে না প্রাচীন আইভি-ঢাকা গৃহের প্রান্তরে অপরাহ্নের দীর্ঘ হ'তে দীর্ঘতর বিলীয়মান ছায়ায় বাঁশীর সুরের তালে তালে স্বচ্ছন্দ আপনা-ভুলানো নাচ। গ্রাম হবে তখন গোল্ডারস্ গ্রীণের পল্লীসংস্করণ। তার মধ্যে থাকবে না সেই সবুজ উদার প্রান্তর, না থাকবে সেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কুটীরগুলি, তাদের গীর্জ্জা ও ইউ, উইলো, পপ্লারে ছায়াচ্ছন্ন সংলগ্ন অঙ্গনটুকু। তার পরিবর্ত্তে আসবে কোন কোন বাছা জায়গায় জাতি ও সরকারের তরফ থেকে যত্নরক্ষিত খানিকটা 'বিউটি-স্পট' যেটা রবিবারে মটর ও সাইকেলের আরোহীতে ভ'রে যাবে। আর সেখানে স্লটমেশিনে চকোলেট থেকে আরম্ভ করে জুতা-বুরুষের সরঞ্জাম পর্য্যন্ত সব মজুত থাকবে। তবু সান্ত্বনার কথা এই যে, যে-রকম ভাবে লোকসংখ্যা কম্‌তির মুখে চলেছে তাতে দু' চার পুরুষের মধ্যে গ্রামে Skyscraper বা ফ্ল্যাটের কোন প্রয়োজনই হবে না।

অতবড় কর্ম্মচঞ্চল শহরও বিশ্রামটুকুর কথা ভোলে নি। তাই পাড়ায়

পাড়ায় মাঠ, বাগান, ফুলের মেলা। আর সে সব হচ্ছে সকলের জন্য, তাই তার মধ্যে যে সার্থকতা আছে প্রাচ্যের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ উদ্যানগুলির মধ্যে তা ছিল না। এগুলি অসাধারণ ব্যাপার কিছু নয়। মোগল উদ্যান দেখে অভ্যস্ত চক্ষু এতে তৃপ্তি পাবে না; কিন্তু সে সব বস্তু অসামান্য—সামান্যদের সমানভাবে উপভোগের জন্য ত তৈরী হয় নি। হাইড্ পার্কে যেখানে রাজা স্বয়ং ঘোড়া চড়ে বেড়াচ্ছেন তার পাশ দিয়েই সার্পেণ্টাইনে এক শিলিং-এর খদ্দের সাধারণ লোক নৌকা বাইছে। তার পারে কত ছেলেমেয়ের খেলা,



সন্ধ্যায় দাঁড় বেয়ে যাওয়া

ভীড়ে বক্তৃতাবাগীশের মেলা, ও দূরে তারুণ্যের লীলা। জলে ক'টি হাঁস ভাসছে, তাদের খাওয়াতে গিয়ে একটি খুকী তার রুমালটি খুইয়ে বস্‌ল, অমনি একজন পুলিশ এসে তার সম্পত্তি পুনরুদ্ধার ক'রে দিল। ইতিমধ্যে কারো তাতে হৃৎস্পন্দন ভয়ে দ্রুত, বা চরণ পলায়নে চঞ্চলশীল, হয়ে উঠ্‌ল না। পুলিশ হচ্ছে লণ্ডনের একটি প্রধান দ্রষ্টব্য; শালপ্রাংশু সে পথের সবাইকে

আশ্রয় দিবার জন্য প্রস্তুত ; আর সবাই তাকে সাহায্য করবার আশ্বাস দিচ্ছে সতত, এমন কিন্তু পথের ভীড়েও। এও হচ্ছে এদেশের একটা প্রধান গুণ। পাঁচটা ছটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে যে-যার গৃহে ছুটবে ; হয়ত রাত্রে কারো সঙ্গে দেখা হবে, হয়ত নাচ বা থিয়েটার আছে, আর কিছু না থাকুক নীড়ের বা ক্লাবের টান ত আছেই। সে বিরাট্ জনতার মধ্যে গতির প্রাচুর্য্য আছে, প্রাবল্য নেই ; তাড়াতাড়ি সকলেরই আছে, তাড়াহুড়ো নেই কারো ; শৃঙ্খলা সবাই মেনে চলে, কারণ শৃঙ্খলা তাদের পথের বন্ধু, পায়ের শৃঙ্খল নয়, গতির বন্ধন নয়।

লণ্ডনের লোক এ যুগে কবিতা পড়ে না ; জীবনে রোম্যান্স আছে কিছু, কিন্তু তা কাব্যের ধার ধারে না। গত যুদ্ধের প্রভাব এখন আর চোখে বাজে না ; কিন্তু তার শিক্ষা এরা ভোলে নি। ঘোর আশানাশ ও স্বপ্নভঙ্গের ভিতর দিয়ে এখনো এদের জীবন যাচ্ছে। যারা প্রৌঢ় তারা যুদ্ধ দেখেছে, যারা যুবক তারা বাবার ভাইয়ের মৃত্যুর খবর পেয়েছে, চারদিকে ত্রাসের আভাস দেখে কচি মুখ শুকিয়ে গেছে কতবার; মাথার ওপব মৃত্যুর রথচক্রনির্ঘোষ শুনতে পেয়েছে বারবার। আর দেখেছে ইংলণ্ডের পরিবার-ভঙ্গের ক্রমান্বয়ে পরিণতি। লণ্ডনে 'ফ্যামিলি' খুব কম ; 'হোমে' আরও কম। সামাজিক রীতিনীতি বন্ধন সব যেন আধুনিকতার বন্যাস্রোতের মুখে একে একে ভেসে গেছে। তার ফলে ঘরকে পর ক'রে পুরুষ বেরিয়েছে একা ; নীড় থেকে নারী এসেছে বাহিরে একাকিনী। পুরুষের হৃদয়ের বিচরণক্ষেত্র বেড়ে গেছে অনেক, আর নারী হয়েছে সাহসিনী। সে আর পুরুষের কাছে অর্দ্ধেক সৃষ্টি ও অর্দ্ধেক কল্পনা নয়। পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে সে জীবিকা-অর্জ্জনেও, তাই তার সম্মানের আসনটুকুও প্রতিযোগিতার বাজারে নেমে সসম্মানে লোপ পেয়ে গেছে। এখন আর কেহ তাকে বাসে

বা ট্রেণে অভিবাদন ক'রে বসবার জায়গা ছেড়ে দেবে না ; সে তা চায়ও না। সে চায় পুরুষের কাছে সমান ব্যবহার ; সে হচ্ছে সহকর্ম্মিণী, সহধর্ম্মিণী হওয়া তার কাছে আজ বড় কথা নয়। সে হচ্ছে আগে কম্‌রেড্, পরে কামিনী। নারী হারিয়েছে তার লালিত্য, যদিও যৌবনের লাবণ্য তার বেড়েই গিয়েছে হয়ত। সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে তার মধ্যে খেলায়, ব্যায়ামে ও নানাভাবে প্রাণ স্ফূর্ত্তি পেয়েছে ; কিন্তু প্রাণপ্রিয়া মূর্ত্তি নিয়ে উঠতে পারছে না। তাই সে আর বিপুল রহস্যের অবগুণ্ঠনের অন্তরালে



রাজহংসের জলকেলি

নেই। সে হচ্ছে তবু নারী, কবিতার নায়িকা সে নয়। আধুনিক কবি কবিতায় তার স্কুল ও ইউনিভার্সিটির দানের প্রতি সম্মান দেখাবে, শ্যামল দেশে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে যে উল্লাস, তার কথা, সঙ্গীতের সাহচর্য্যের কথা লিখবে। কিন্তু গৃহ ও একনিষ্ঠ প্রেম কবিতার উপজীব্য হিসাবে প্রায় অচল হয়ে একমাত্র চলচ্চিত্রের পর্দ্দাতেই চলমান হয়ে রয়েছে।

কবিতা গৃহকে ছেড়ে দেশকে ধরেছে; স্থানীয় ভূমিখণ্ডটুকুকেও আশ্রয় করেছে। বন্ধুদের সঙ্গ ও জীবনের আসক্তি খুব বড় হয়ে দেখা দিয়েছে; loyaltyর চেয়ে বড় কথা আর নাই; কিন্তু নারী ও পুরুষের সম্বন্ধের বেলায় তা তেমন প্রবল নয়।

পুরুষ ও নারী যদি এত পরস্পব থেকে স্বাধীন ও সুদূর হ'য়ে যায় জীবিকার প্রয়োজনে ও জীবনের আহ্বানে—প্রেমের কবিতার প্রয়োজনও কমে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। আর একনিষ্ঠ বা 'জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার' প্রেম অনুভব করা ফ্ল্যাপারদের কাছে কেবল ভাবাবেগের বাষ্পময় সেন্টিমেণ্টালিটি বলেই গণ্য হবে। টেনিসনের আদর্শ একালের জন্য নয়, ব্রাউনি্-এরও একটা দিক্ সম্পূর্ণ অচল। একালের প্রেমিক যার প্রতি ইহজীবনে প্রেম নিবেদন করা ঘটে ওঠেনি সেই মৃতা প্রেয়সীর হাতের মুঠার মধ্যে একটি পাতা রেখে জন্মজন্মান্তরের স্রোতে ভাসতে ভাসতে কোনদিন তাকে লাভ করবে এ বিশ্বাসে সান্ত্বনা পাবে না; ইহলোকের উপরই যার দাবী দৃঢ় নয়, অন্য কোন ভাবী জন্মের উপর তার আস্থা থাকবে কেমন করে? 'That it fades from kiss to kiss' একথা যে জেনেছে তাকে মূল্য দিতে হয়েছে বহু; তার হৃদয় তাই হয়ে উঠেছে চঞ্চল ও অনেকনিষ্ঠ। পথে পথে কত নব পরিচয়, নব অনুভব, স্মৃতির পথ বেয়ে কত মূর্ত্তির আনাগোনা; তারমধ্যে কোন্‌টি প্রতিমা হ'য়ে পূজা পাবে তার কি ঠিক? আর তার বিসর্জ্জনের সময় আসবার আগেই অন্য মূর্ত্তির ছায়া এসে পড়তে পারে। হয়ত একটি আগেরটির চরণচিহ্ন পর্য্যন্ত মুছে লোপ করে দিল, কারণ স্মৃতি ত প্রীতির আসন জুড়ে বসে থাকতে পাবে না। জীবন্ত এরা চায় জীবন্ত প্রেম। স্মৃতি হিমশীতল, তার মধ্যে ত প্রাণময়তার কবোষ্ণ স্পর্শ, নিঃশ্বাসসুরভি নেই। কাল যা ছিল তা আজ নেই বলে যে কাঁদতে হবে চিরকাল তার কি মানে আছে? নূতন এসে সে ব্যথায় প্রলেপ দিয়ে শূন্যকে পূর্ণ ক'রে তুলবে। আগেকার চরণচিহ্ন মুছে লোপ করে দেবে।

কিন্তু নূতনও ত না টিকতে পারে? সে অবস্থায় কাকে মর্ম্মের মন্দিরতলে অনন্ত জীবন দিয়ে প্রতিষ্ঠা দেওয়া যায়? এ হচ্ছে হিরাক্লিটাসের দর্শনবাদের যুগ। এই মুহূর্ত্তে নদীর যে জলবিন্দুটা এখানে আছে পরমুহূর্ত্তে ঠিক সেটুকু আর নেই। কিন্তু দুটি বিন্দুই একটি আরেকটির চেয়ে কম সত্য



একটি বিবাহিতা নারীর পুরুষালি

নবীনা কারো সঙ্গে দেখা হ'ল "পথে যেতে যেতে পূর্ণিমা রাতে", তার আকর্ষণে স্মৃতিতে টান পড়ল পুরাতনার কথা মনে হ'ল, সে কোন্‌দিন বলে গেছে তার প্রেমকে বৃক্ষশাখায় পত্রের মত সহজভাবে নিতে; সে কোন্‌

দিন বলেছে আঁধার রাতে তারা দু'টি তরণী আলোক ফেল্‌তে ফেল্‌তে সৌহার্দ্দের বাণী ঘোষণা ক'রে কোন দিন হয়ত অন্তরালে মিলিয়ে যেতে পারে। সে-সব স্মৃতি ও চিন্তার স্রোতে টলমল করতে করতে কোথায় হয়ত পুরাতনার আসন নবীনার আহ্বানের কাছে পরাজয় স্বীকার ক'রে ভেসে যাবে তার ঠিক নেই।

বিশেষ ক'রে যখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কল্যাণে সুয়োরাণী-দুয়োরাণীর পালা উঠে গেছে। তোমার বরমাল্যের সবক'টি ফুল আমায় দাও, তার মধ্যে কোন ভাগাভাগি সহ্য হবে না; তোমার হৃদয়াকাশে আমি একটি চন্দ্র হয়ে বিরাজ করব, কোন ম্লান তারকার সেখানে ঠাঁই হ'বে না এবং আমার স্বতন্ত্র সত্তাও ক্ষুণ্ণ হবে না। এ-সব আদর্শ নিয়ে কিন্তু আধুনিকার জ্বালা কম নয়। স্বাধীনতার কল্যাণে না টিকৃল তার ঘর, না জুট্‌ল বর, না ঘট্‌বে হয়ত জীবনে প্রিয়তমের আবির্ভাব। তাই সে জীবনকে যেমন লঘুভাবে গ্রহণ করছে তেমনি একবার আঘাত পেলেই নুয়ে পড়ে না, অশ্রু মুছে জীবনে নূতন অধ্যায় আরম্ভ করে। তবে কি এইরকম প্রেমধারায় কোন তত্ত্ব নেই? তা ভাবলে ইয়োরোপের যৌবনকে ভুল বোঝা হবে। এদের মন্ত্র কবির ভাষায় বল্‌তে গেলে—

I have been faithful to thee, Cynara, in my fashion.

ইংরেজচরিত্রের হিসাব এত সহজে দেওয়া যায় না। তার দেহ যেমন বিশাল, তার হৃদয়ও তেমন গভীর। সে কথা কয় কম, আলাপ করে আরো কম, আর হৃদয়ের অনুভূতি বাহিরে প্রকাশ করতে চায় না। চিত্তের সুখে মত্ত আত্মপ্রসাদময় যার দিনগুলি বর্ষার গঙ্গায় উৎসর্গ-করা শতদলের মত স্বচ্ছন্দভাবে ভেসে যাচ্ছে বলে মনে করছি, একটা দুর্লভ মুহূর্ত্তে একটা আন্তরিক সহানুভূতির বাণীতে হয়ত তার বেদনাবিদ্ধ নূতন একটা স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে যাবে। শৈলসম অচপল প্রেম এত গভীরভাবে কি করে লুকানো থাকে?

জনবুলের চরিত্র বিচিত্র। একটি অধ্যাপককে পুস্তক-কীট বলেই জানতাম। তাহার রুক্ষ মনটি প্রাচীন বটগাছের ঝুরির মত জনবুলের



চন্দ্রীর হাসি

দেশের মাটীতে সহস্র দিক্ দিয়ে শিকড় গেড়ে আছে ও সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপের চরিত্রের সব রকম সম্ভব কোণীয়তা (angularities) যেন তার বহিরাকৃতির ভিতর থেকে তীক্ষ্ণ ফলার মত উঁকিঝুঁকি মারছে। সেই বৃদ্ধকে ব্যঙ্গচিত্রবিশারদদের নিষ্ঠুর তুলিকার মুখে মনে মনে কতদিন যে সমর্পণ করেছি তার ঠিক নেই। সেই তিনি, পয়লা মে সকালবেলা যখন তাঁর সামনের দিকের বাগানে সোণার আলো ফুলের উপর হিল্লোলিত হচ্ছিল আর সেই নির্জ্জন পল্লীতে গাছে গাছে পাখীর ডাকে উৎসবের সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল, তখন সংগোপনে তাঁর গৃহের পিছনে ফুলে-ফুলে শুভ্রহাস্যে উচ্ছ্বসিত একটি চেরীগাছের নীচে নতজানু হ'য়ে হাউসম্যানের কবিতা পাঠ করছিলেন। পাণ্ডিত্যের ও বার্দ্ধক্যের সহস্র রুক্ষতার ছদ্মবেশের ভিতর থেকে একটি কবিপ্রাণের কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ অশ্রুবিন্দুর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হ'ল।

স্পেনের সন্ধানে

১

কাল শেষরাত্রে শেষ শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নার মধ্যে বোর্দো থেকে হিস্পানীদের গান শুনতে শুনতে পীরেনীজ পর্ব্বতমালার ইরুণ গিরিবর্ত্মে এসেছি। এই গান খুব পরিচিত মনে হ'ল; দু-মাস ইংলণ্ডের শীতের জড়তার মধ্যে এতটা সহৃদয়তা, এতটা আকর্ষণ পাই নি। লণ্ডনের কন্সার্ট হলের সুষ্ঠু শীলতা ও সুকঠিন আচারনিষ্ঠা প্রথম প্রথম বিদেশীকে অভয় দিতে পারে নি; কিন্তু কাল রাত্রে পার্ব্বত্য হিস্পানীদের গান আমাদের রাখালদের গানের মত জ্যোৎস্নার আভাসে ভরা আকাশে মিলিয়ে গিয়ে আমায় আশ্বাস দিচ্ছিল। তাই শেষ-রাত্রে সীমান্তের ষ্টেশনে অপরিচিত গ্রাম্য ও পার্ব্বত্য লোকগুলির দুর্ব্বোধ্য ভাষা সত্ত্বেও স্পেনকে বিশ্বাস ক'রে হৃদয়ে বরণ ক'রে নিলাম।

আলো, আলো! কত মাস পরে জীবনের সাড়া পেলাম ব'লে মনে হ'ল। ইংলণ্ডের ম্লান, মেঘাচ্ছন্ন, কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশের একটা রূপ আছে। সে রূপ উপভোগ করতে হ'লে বহু ধৈর্য্য ধ'রে ইংলণ্ডের অবগুণ্ঠন মোচন করতে হবে। কুয়াশায় পথ হারিয়ে ঘুরে ঘুরে অজানার সন্ধানের আনন্দ পেতে হবে; আণ্ডারগ্রাউণ্ডে সময়মত কলেজে না গিয়ে শীতের প্রভাতে 'বাসে' গিয়ে রক্তসূর্য্যের হরিদ্রাভ অপমান দেখতে দেখতে দেরি ক'রে ফেলে' এবং ক্লাস কামাই ক'রেও বিষণ্ণ ভাব দূর ক'রে ফেলতে হবে; রাত্রে বিজলী বাতি বা জ্যোৎস্নার আলোয় স্কেটিং করতে হবে দূর প্রান্তরে। সব মানি, মানি যে, অন্ধকারের অন্তরালে আকাশ ও পৃথিবীর যুগল তপস্যার মধ্যে একটা স্তব্ধ গাম্ভীর্য্য আছে; কিন্তু তার মধ্যে একটা ক্লান্তির চিহ্ন ধরা পড়ে ব'লে মনে হয়। তাই স্পেনের আলো আমার কাছে জীবন এনে দিল।

পীরেনীজ শৈলমালার কয়েকটা চূড়াতে একটা অপূর্ব্ব নীল আভা মূর্চ্ছিত হয়ে রয়েছে, যেন নিশান্তের সুখস্বপ্নের আব্‌ছায়া স্মৃতিখানি। কত যুগ এমন স্নিগ্ধ নীল আলোয় ভরা উষার মোহন রূপ দেখি নি। আজ প্রথম কৈশোরের আনন্দের মত একটা অকারণ আনন্দ মনকে মাতিয়ে তুলল। পরীক্ষার চিন্তাভারাক্রান্ত মন নয়, আকাশের পাখীর লঘু সরল অস্তিত্বের মত মন নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। উষা যে নিঃশ্বাসরুদ্ধ হৃদয়ে প্রভাতের জাগরণের ভাষা শুনতে শুনতে মৃদু চরণক্ষেপে এখনই চলে যাবে। পথে ঘাটে শীতকাতর হিস্পানী কম্বলে-মোড়া অবস্থায় জড়সড় হয়ে চলেছে; একটা গা । রাস্তার পাশ দিয়ে যাচ্ছে; একটা ছোট ঘোড়ায়-টানা গাড়ী অনর্থক দাঁড়িয়ে আছে; একটা দোকানের সামনে খানিকটা কাদা, জল দিয়ে সে জায়গাটা পরিষ্কার করবার শ্লথ চেষ্টা হচ্ছে। লণ্ডনের প্রভাতের চাকরাণীর কর্ম্মব্যস্ততা, দুধওয়ালার ক্ষিপ্রপদে দ্বারে দ্বারে দুধ রেখে যাওয়া, কুলি-মজুরের আণ্ডারগ্রাউণ্ড বা ট্রামের পথে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ান, এ-সব পেলাম না, তাই পথগুলি বড় খালি মনে হ'তে লাগল। হঠাৎ দেশের কথা মনে পড়ল; আবার ইংলণ্ডে সদ্যোলব্ধ উল্লাসের প্রাচুর্য্যের কথাও ভাবলাম, বুঝলাম ইংলণ্ডের শিক্ষার ফল আমার উপর ফলছে, তাই সে দেশের কর্ম্মবহুল, চঞ্চল, সফল জীবনের স্পর্শ পেয়ে এত ভাল লাগে।

মনের মধ্যে রৌদ্রের উত্তাপ অনুভব করতে পারছি। ইংলণ্ডেও এই উত্তাপ দেখেছি। যেদিন একটু সূর্য্যের আলো অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা দেয় অমনি দলে দলে লোক শহরের বাইরে চলে যায়, ছেলেরা খেলতে যায়; লণ্ডনের মাঠগুলি সূর্য্যোপাসকের দলে ভরে যায়। লণ্ডন কলকাতা নয়, সেখানে প্রত্যেক পাড়ায় নিঃশ্বাস ফেলবার ও আরামে বেড়াবার বাগান আছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও প্রয়োজনীয়তার কথা অত বড় কর্ম্মচঞ্চল, গতিময় শহরও ভোলে নি। শুধু ধনী লণ্ডনই বা কেন? ছোট শহর ও গ্রামগুলিতেও সেকথা সবাই মনে রাখে; গ্রামটিকে ও তার চারি পাশকে সাজিয়ে রাখবার কত ইচ্ছা ও চেষ্টা। আমার চোখ নিশ্চয়ই এখনও ইউ-

রোপীয় হয়ে যায় নি ; কিন্তু গ্রাম্য ইউরোপের পাশে গ্রাম্য বাংলাকে দাঁড় করিয়ে অনেক বার মনে হয়েছে যে, আমাদের দেশের কবিরা নিছক সত্য কথা লেখেন নি ; তাই বাংলার রূপ যতটা পাই কবিতায় ও কল্পনায়, ততটা জীবনে পাই নে। মনে বাংলার রঙের পরশ যতটা বেশী থাকা উচিত ছিল ততটা হয়ত নেই। এ-কথা কি করে অস্বীকার করব যে, মনের মধ্যে গ্রামের যে সুন্দর, প্রাণময়, লীলায়িত, আনন্দরসাস্পদ চিত্র আঁকা ছিল তার সঙ্গে দেখলাম বাংলার গ্রামের চেয়ে ঔপন্যাসিক হার্ডির গ্রামগুলিই বেশী মিলে গেল।

২

ভারতবর্ষে ধারণা আছে স্পেন হচ্ছে ইউরোপের মধ্যে একটুকরা ভারতবর্ষ। সে-কথাটা পরীক্ষা করবার ইচ্ছা বার-বার জেগে উঠেছে। পীরেনীজের পার্ব্বত্য অঞ্চলে ও অন্যান্য ছোট শহরে উত্তর-ইউরোপের কর্ম্মচঞ্চলতা বা উৎসাহের প্রাচুর্য্য পেলাম না। এণ্ডোরা নামে স্পেন ও ফ্রান্সের মাঝখানে যে রাজ্যটুকু আছে সেখানেও এই অবস্থা। পথে ঘাটে গতির আরাম আছে, আবেগ নেই ; নগরবাসিনীর মৃদুমন্দ গমনে ছন্দ আছে, লীলা নেই। লণ্ডনের জনতাপূর্ণ পথে কিন্তু মনে হয়েছিল যে, ইংলণ্ডে সবাই নিয়ম মেনে চলে, কারণ পথের শৃঙ্খলা সে দেশে কারও পায়ে শৃঙ্খল হয়ে বাজে না, সহস্র লোকের চলাচলের মধ্যে তা বন্ধুমাত্র, বন্ধন নয়।

স্পেনের গ্রাম্য পোষাকও ঠিক ইউরোপীয় ছাঁদের নয়। ইউরোপীয় পোষাকের সুকঠিন সুষ্ঠু ভাব এখানে আশা করা যায় না। মেয়েদের পিঠে সুন্দর ঝালর-দেওয়া শাল,—রেশমী শালে জড়ান পোষাক ভারী সুন্দর দেখায়। পুরুষদের মাথার ক্যাপগুলিতে বিশেষত্ব আছে। এদেশে মূররা বহু শতাব্দী, পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব ক'রে গিয়েছে। তাদের ও ইহুদীদের রক্ত-সংমিশ্রণ দ্বিতীয় ফিলিপের রাজত্বকালের আগে বহু পরিমাণে হয়েছে ; তার

ফল আকৃতিতে, হাবভাবে ও জাতীয় চরিত্রেও যথেষ্ট দেখতে পাই। স্প্যানিশ লোকের গঠন কিছু স্থূল ও খর্ব্ব, বর্ণ অলিভ অর্থাৎ উত্তর-ইউরোপের লোকের মত অত শাদা নয়; চোখের কটাক্ষ গভীর ও কাজল; ভ্রূভঙ্গীতে একটা প্রাচ্য আভাস পাই। লোকগুলি সহজে পথের দেখায় বন্ধুত্ব পাতায়, মন খুলে গল্প করে, আবার হঠাৎ ধৈর্য্য ও শান্তি হারায়। অনেকটা সুয়েজের এ-পারের মত আবহাওয়া। একবার পথে বেরিয়ে একটি ঘণ্টার মধ্যে নূতন আলাপ ও নিবিড় বন্ধুত্ব এবং তীব্র বিদ্বেষ ও ভীষণ শত্রুতা পথেই অভিনীত হচ্ছে দেখে এলাম। প্রকৃতি মানুষ গঠন করে; রৌদ্র ও শীত চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তার উপর বিদেশী মূরের অধীনতায় বহুদিন বাস করায় জাতীয় চরিত্রও পরিবর্ত্তিত হয়েছে। ইতিহাস দেখিয়েছে যে, স্বাধীন হবার পর বিদেশী প্রভাবের ফল দূর করার জন্য স্পেন প্রবল চেষ্টা করেছে। স্পেন মূর ও ইহুদীর বিরুদ্ধে শান্তিহীন ক্ষমাহীন মর্ম্মান্তিক যুদ্ধ চালিয়েছে; ইউরোপের ধর্ম্ম ও রাজনীতির নেতা ও বিধর্ম্মী তুরস্কের বিরুদ্ধে রক্ষাকর্ত্তা হয়েছে। সেই যুগে স্পেন একই কালে সমস্ত ইউরোপে ও বাহিরের জগতেও সৈন্য পাঠিয়েছে; ধর্ম্মের নামে অমানুষিক অত্যাচার করেছে বীরত্বের আবরণে। তবু স্পেন পূর্ণ-মাত্রায় ইউরোপীয় হ'তে পারে নি এবং তার রাজনীতির অবনতি, অভিজাত সম্প্রদায়ের অধঃপতন ও পীড়নের ফলে অধীন প্রজার বিদ্রোহ ঠিক প্রাচ্যভাবেই হয়েছে। ইউরোপ বলতে যা বুঝি স্পেন তার সবটা আমাদের দিতে পারে না।

তাই যখন এই প্রাচ্যভাবাপন্ন পোষাকে সজ্জিতা হিস্পানীদের মধ্যে একটি মেয়েকে নিখুঁত হাল-ফ্যাশানের পোষাকে দেখলাম তখন একটু বিস্ময়েই তার দিকে না তাকিয়ে পারলাম না। পাহাড়ের উপর তখন রৌদ্র, ছায়া ও নীলাঞ্জন একটা অপূর্ব্ব মোহ বিস্তার করছে। অস্তরশ্মি-উদ্ভাসিত বেলাশেষের আকাশের সব ঐশ্বর্য্য তখন ইরুণ থেকে সান সিবাষ্টিয়ানের পথে একটি হ্রদের উপর প্রতিফলিত হচ্ছে। সেই আসন্ন অন্ধকারের মোহিনী মায়ার মধ্যে বুঝলাম

যে, এই মেয়েটি জাতিতে হিস্পানী কিন্তু আমারই মত ভ্রমণপর। মেয়েটি সুন্দরী নয়, কিন্তু শোভনা। সে যা-কিছুতে হাত দেবে তারই মধ্যে অননুভবনীয় স্পর্শ জেগে উঠবে এমনই একটা সুকুমার কান্তি তার আঙুলের মধ্যে আছে। কালিদাস তার লীলাচঞ্চলতা দেখে তাকে বনহরিণীর সঙ্গে তুলনা করতেন। অথচ প্রতি রক্তকণায় সে নগরবাসিনী। তার ভাল লাগা ব'লে কোন জিনিষ নেই; ভাল লাগলে হৃদয় থেকে সেই ভাব প্রকাশ কেমন ক'রে হ'তে পারে তা সে ভুলে গেছে। এই শ্রেণীর নারী নিজের বাহিরে আর কারও কথা সহজ ভাবে ভাবতে পারে না। আমার মনে হয়, ইউরোপের অবাধমিশ্রণের সমাজে, সকলের স্তুতিবাদক্লান্ত রূপকে এই মূল্য দিতেই হবে। যদিও মেয়েটি রঙীন আকাশের তলায় ধূসর পাহাড়ের একটা সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য দেখে ব'লে উঠছে, "কি সুন্দর, নয় কি", যদিও সে এই লোকগুলির অদ্ভুত পোষাক ও মনোহর চলনভঙ্গী দেখে মৃদুস্বরে বলছে "কি অদ্ভুত, চমৎকার", তবু জানি যে সে সেই বিরাট্ ও স্তব্ধ সৌন্দর্য্যের মধ্যে নিজেকে একটু বাহিরের জগতের ব'লে মনে করছে। সে এই নিরুদ্দেশের আহ্বানময় দৃশ্যের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে নি, আর সে জন্য এই উদাস বৈরাগ্যের ধূসর চিত্রপটের সামনে তার উজ্জ্বল পোষাক, ফ্যাশনের চূড়ান্ত একটা স্কার্টের পাশের পকেটে হাত রেখে অঙ্গ হেলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, একটা প্রতিবাদের মত দেখাচ্ছে। সে যেন বুলভার-এ বেড়াতে এসেছে, সে পথিক নয়। তার চরিত্র হচ্ছে আত্ম-সচেতন, তার মনের জন্মভূমি প্যারিসের এক টুকরা, জাবনের মানদণ্ড ফ্যাশন।

যেখানেই যাই এই রকম টুরিষ্টের সন্ধান পাই। 'আমেরিকান টুরিষ্ট' কথাটা একটা অবজ্ঞেয় সংজ্ঞা পেয়েছে। কিন্তু শুধু আমেরিকানরাই বা দোষী কেন? বেশীর ভাগই বাহিরে বেড়াতে আসে ক্লাবে ও সমাজে নাম কিনবার জন্য, দলের মধ্যে দশ রকম কথা বলতে পারবার জন্য। সবাই 'টুরিষ্ট এজেন্সী'র বিজ্ঞাপন ও 'গাইডে'র হাতে আত্মসমর্পণ ক'রে বিনা প্রতিবাদে, চোখ না খুলেই, বিখ্যাত চিত্রশালা ও জন্তুশালা, রাজপ্রাসাদ ও ভূতুড়ে দুর্গ দেখে বড়

হোটেলের বাঁধা ভোজ খেয়ে নিজের দলের বা সেই হোটেলের অন্যান্য ভ্রমণকারীর সঙ্গে থেকে নির্ভাবনায় সময় কাটিয়ে যায়। ইংরেজ ও আমেরিকান সব সময়ই ইংরেজী কথা বলা যায় এমন হোটেলে আস্তানা নেবে। এ-বিষয়ে বিদেশী সামান্যবিত্ত ছাত্র সৌভাগ্যবান্। সে থাকবে দেশীয় হোটেলে বা কোন লোকের বাড়ীতে কাঞ্চন-মূল্যে; ভোজন তার নিজে আবিষ্কার করা পথ-পার্শ্বের রেস্তোরাঁয়, পরিচয় অপরিচিতের সঙ্গে। আর সব চেয়ে বড় সৌভাগ্য যে সে নিজেকে ভুলতে বা ভোলাতে দেশ-ভ্রমণে আসে না, আসে নিজেকে জাগাতে।

ইউরোপ ও আমেরিকার পথের লোক অন্য কোন কারণে না হ'লেও একটা বিশেষ মানসিক কারণে ভ্রমণকারী হ'তে বাধ্য। তারা নিজেদের ভুলতে চায়। সৌভাগ্যের অনিত্যতা, জীবনের লক্ষ্যহীনতা ও অনেক সময় উচ্চাকাঙ্ক্ষার নির্বুদ্ধিতা তাদের জীবনকে একটা উদ্দেশ্যহীন, নিরবচ্ছিন্ন গতি দেয়। সেই গতির আবেগে এরা মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হয়। স্পেনের শ্রেষ্ঠ সমুদ্র-বিলাসের স্থান সান্ সিবাষ্টিয়ানে বিস্কে উপসাগরের ব্রেক-ওয়াটারের পিছনের অচঞ্চল জলে সাগরস্নান করতে করতে এই কথাই মনে হ'ল। সামনে সমুদ্রের অসীম নীল নিদ্রাকরুণতা, দুই পাশে আসামের মত বিটপীশোভিত পর্ব্বতশ্রেণীর শ্যামশান্তি। এই দৃশ্যের মধ্যে ত ভ্রমণকারী দল নিজেদের মিলিয়ে দেয় না; কেহ হৈচৈ ক'রে সমুদ্রস্নান করে, কেহ স্পেনের চমৎকার মোটর-পথে বহুদূর চলে যায়, কেহ সন্ধ্যায় হোটেলের বিস্তীর্ণ বিলাসলীলাময় নাচঘরে আত্মবিস্মৃত থাকে। আত্মবিস্মরণের এই প্রাণপণ চেষ্টাই তাদের অনেকের উদ্দেশ্যহীন জীবনের উদ্দেশ্য। নিজেকে বিস্মৃত হবার, চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত করবার প্রবল তৃষ্ণায় তারা আনন্দের পর আনন্দের সম্ভারে দিনরাত্রি পূর্ণ রাখতে চায়। আজকাল উল্লাস ও উত্তেজনা না হ'লে চলে না, কারণ সকলেই গত মহাযুদ্ধের পর থেকে নিজের অসহায় ক্ষুদ্রতার কথা ভাবতে ভয় পায়। যা অনন্ত ও চিরন্তন তা ইউরোপে সান্ত ক্ষণস্থায়ী জীবনে এ-যুগে কোন

আশ্বাসের বাণী দিতে পারছে না। কিন্তু এ আনন্দের অন্বেষণও কাউকে বেশী দিন তৃপ্ত রাখতে পারছে না, কারণ তা লঘু, অগভীর ও বিরামহীন। ইউ-রোপের সব আনন্দের পণ্যশালাতেই একটা অতৃপ্তির ভাব দেখি যাকে ফরাসী ভাষায় বলে 'blase', যাদের জীবনে এত গতি, এত উদ্দামতা তারাও নির্জ্জন মুহূর্ত্তে ব'লে উঠে—হাউ বোরিং!

৩

ডিসেম্বর মাসের প্রভাত বাহিরের তুষারের প্রতিফলিত আলোকে উজ্জ্বল, কিন্তু নানা রঙে আঁকা কাচের মধ্য দিয়ে অতি সামান্য একটু আলো সালামাঙ্কার প্রাচীন বিরাট্ গীর্জ্জার মর্ম্মর-স্তম্ভের অন্তরালে ক্রুশের উপর মূর্চ্ছিত হয়ে রয়েছে। এই গীর্জ্জায় মূরীয়, বাইজেণ্টাইন ও গথিক—তিন রকম শিল্পধারারই যে অতুলনীয় সমাবেশ ও ক্রমবিকাশের উদাহরণ রয়েছে তা থেকে আমার দৃষ্টি অন্য দিকে আসতে বাধ্য হ'ল। আমি বিস্ময়ান্বিত হয়ে আপাদমস্তক কালো পোযাকে আবৃত একটি স্থির, নতজানু, ধ্যানরত হিস্পানীকে দেখছিলাম ও মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করছিলাম যে খৃষ্টধর্ম্ম পাশ্চাত্যকে প্রাচ্যের দান। এই দৃশ্য ত এত দিনেও ইউরোপে ধর্ম্মমন্দির ছাড়া আর কোথাও দেখলাম না। এ যেন আমাদের অতি-চেনা, এর সঙ্গে অন্তরের পরিচয় আছে। যে ভূমি-খণ্ডে এই পূজারী রয়েছে সে যেন ইউরোপের মধ্যে প্রাচ্যের এক টুকরা। প্রতীচ্যের অন্ধ গতিবেগ, সান্ত ও ক্ষণস্থায়ীর প্রতি অনুরাগকে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাবই প্রাচ্যের স্বভাবসুলভ ধ্যানের স্থিতিশীলতা দিয়ে সংহত ক'রে রেখেছে; চিত্তবিক্ষেপ থেকে সমাধি, বিষয় থেকে আদর্শ, আত্মবিস্মরণ থেকে মননে ফিরিয়ে এনেছে।

সালামাঙ্কা প্রাচীন স্পেনের একটি অক্ষুন্ন পরিপূর্ণ চিত্র। সৌভাগ্যক্রমে বর্ত্তমানের কালোপযোগী ক'রে তুলবার প্রয়াস এই শহরটির মাধুর্য্য নষ্ট ক'রে দেবার চেষ্টা করে নি। যে-যুগে গ্যালিলিওর আবিষ্কার ইউরোপের আর

কোথাও স্বীকৃত না হ'লেও এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে সে-বিষয়ে বক্তৃতা শুনতে বা কলম্বসের অদ্ভুত নূতন আবিষ্কারের কাহিনী শুনতে দশ হাজার ছাত্র আঁকা-বাঁকা গলিপথ দিয়ে যাতায়াত করত, সে-যুগ এখনও এখান থেকে একেবারে চ'লে যায় নি।

শঙ্খগৃহের (Casa de las Conchas) বনিয়াদী ঘরোয়া প্রথার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কারুকার্য্যের উপর বিংশ শতাব্দীর কোন ছাপ এখনও পড়ে নি। মধ্য-যুগের রঙীন চামড়ার সৌখীন হাতের কাগজের শিল্পে সালামাঙ্কা বর্ত্তমান ভেনিসের চেয়ে বড় ছিল। কলেজের ছাত্ররা এখনও তাদের বই এই চামড়ার সুদৃশ্য আবরণে ঢেকে রাখে। এখনও পঁচিশটি কলেজের ও ষাটটি মঠের সম্পদ্ হচ্ছে তাদের যত্নরক্ষিত কারুকার্য্যখচিত পুস্তকাগারগুলি ও বিশেষতঃ ধর্ম্ম-পুস্তকের বিভাগ। একটির ভিতর থেকে যেদিকেই তাকাই, বিরাট্ গীর্জ্জাটিই শুধু চোখে পড়তে লাগল। সমস্ত শহর ছাড়িয়ে, তার সকল সাংসারিক কর্ম্ম ও কর্ত্তব্যকে ছাপিয়ে, তার সব আশা ও বিশ্বাস, প্রেরণা ও সাধনাকে মূর্ত্তি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই সালামাঙ্কার গীর্জ্জা। যারা বলছে যে পাশ্চাত্য জাতির ধর্ম্মের প্রয়োজন নেই তারা ঠিক বলছে না। স্পেনে রাজা আলফন্সোর পলায়নের পর থেকেই গণতন্ত্র ক্যাথলিক ধর্ম্মকে রাজধর্ম্মের পদ থেকে চ্যুত করেছে, ক্যাথলিক-পরিচালিত স্কুলগুলি লোপ ক'রে দিয়েছে, দেবোত্তর ও ধর্ম্মোত্তর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ক'রে নিয়েছে। তার ফল আজ রাজনীতিক চাঞ্চল্য ও অশান্তির মধ্যে, নব্য স্পেনের সরকারী স্কুলে শিক্ষকের অভাবে, কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে প্রকাশ পাচ্ছে। স্পেনের গীর্জ্জায় অনেক দোষ ছিল, বৈষয়িকতা তার মধ্যে বহুপরিমাণে ছিল, যাজক হওয়া একটা লাভজনক ব্যবসায়ে পরিগণিত হয়েছিল। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম হিস্পানীদের অন্তরে অনেকখানি স্থান অধিকার করেছিল। ধর্ম্ম বলতে আমি কোন পারলৌকিক মঙ্গলের অনুষ্ঠানমাত্রকেই বলছি না।

ধারণাদ্ ধর্ম্ম ইত্যাহুঃ······যঃ স্যাৎ ধারণসংযুক্তঃ স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।

কুশাসিত, বিভক্ত-প্রদেশ, স্থিররাজনীতিহীন স্পেনের বিক্ষুব্ধ, বিক্ষিপ্ত জনসাধারণের চিত্তকে ধর্ম্মই একপথে চালিয়ে নিয়েছিল। যে বৃদ্ধকে আমার সামনে বিরাট্ আড়ম্বরময় প্রাচীন মন্দির উপাসনা করতে দেখেছি তার অন্তরের মধ্যে ধর্ম্ম একটি গোপন প্রকোষ্ঠ অধিকার ক'রে রেখেছিল। তার সেই বিরামগৃহ যখন লোপ পেয়ে যাবে, তার অন্তরের আশ্রয় আর থাকবে না, তখন সে খুব সহজেই বার্সিলোনার ছাত্র-বিপ্লবীদের পর্য্যায়ে চলে যাবে।

৪

মঠ ও মন্দির, প্রাসাদ ও স্মৃতিসৌধ সম্পন্ন 'এস্কোরিয়াল' গৃহটি স্পেন ও ক্যাথলিক ধর্ম্মকে যা-কিছু গঠন ক'রে রেখেছে কালের দ্বারা অস্পৃষ্ট তারই কয়েকটি স্মরণচিহ্ন বহন ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। এ-হিসাবে এস্কোরিয়ালের স্থান দিল্লী বা ফতেপুর সিক্রির উপরে। এই জায়গাটি দিল্লীর মতই একটি বিলুপ্ত যুগের মূক প্রহরী। তার প্রাসাদ আছে, প্রহরী নেই, রাজপ্রেয়সী নেই। কিন্তু দিল্লীর কাছে নূতন দিল্লী হয়েছে ; নূতন রাজপুরুষদের পদশব্দে রাজপথ মুখরিত হ'তে পারে যদিও ওমরাহদের সব চিহ্ন ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে গেছে। এস্কোরিয়াল ফতেপুর সিক্রির মত অতীত যুগের চিহ্নগুলিকে সগৌরবে বহন ক'রে আসছে ; সে-যুগের পারিপার্শ্বিক অবস্থারও বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নি। এ ধারণাটি সবচেয়ে বদ্ধমূল হয় এখানকার লোকদের সঙ্গে আলাপে। এদের চিন্তা ও স্বপ্ন এখনও মধ্যযুগ ছাড়িয়ে বর্ত্তমানে এসে পৌছয় নি। এখানে কার্ল স্ কিন্তো (পঞ্চম চার্ল স্) ও ফিলিপ সেগুন্দো (দ্বিতীয় ফিলিপ) সম্বন্ধে এমন ভাবে কথা কয় যেন তারা গতকালের বিদায়-নেওয়া বন্ধু ; সিয়েরা গুয়াদারামা পর্ব্বতের নীলাঞ্জন ছায়ায় যেন এখনও তাদের অশ্ব-খুরের ধূলা মিলিয়ে যায় নি।

এস্কোরিয়ালের সঙ্গে বহির্জগতের কোন সম্বন্ধ নেই। মাদ্রিদ-প্যারিস এক্স্প্রেসে মাদ্রিদ থেকে মাত্র এক ঘণ্টার পাড়ি ; কিন্তু মাদ্রিদের কোন

অসন্তোষের বা চাঞ্চল্যের ঢেউ এখানে এসে পৌছয় না। দ্বিতীয় ফিলিপ চেয়েছিলেন যে তাঁর জীবনের ধর্ম্মময় শেষদিনগুলি শান্তিপূর্ণভাবে এখানে কাটবে; সেই বৃদ্ধ সম্রাটের জীবন বৃহৎ সাম্রাজ্যরক্ষা ও বিস্তৃতির টানা-পড়েনে অশান্তিতে ভ'রে উঠেছিল কিন্তু তাঁর সন্ন্যাসের প্রাসাদটি এখনও শান্তিতে অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এখানে সেণ্টদের উৎসবগুলি এখনও ধূলিধূসরিত কিন্তু আড়ম্বরময় মঠের ভিতর নিয়মিতভাবে পালিত হয়। সেগুলিই এখানকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। সিয়েরা গুয়াদারামার নীল চিত্রপটের সামনে ধূসর, ধূপসুরভিত, উপাসনানন্দিত এই সৌধের চারি দিকে একটা অননুভবনীয় সৌন্দর্য্য আছে। শহরতলীও এমন চমৎকার মাধুর্য্যে ভরা যে-মাধুর্য্য মধ্যযুগের ইতিহাসের পাতা থেকে নেমে এসে এখানে রয়ে গিয়েছে। যুবরাজের প্রাসাদের উদ্যানপথে ছোট ছোট ছেলেরা পাথরে বাঁধান সিঁড়ির তৈরি রাস্তায় এমন ভাবে আধটি পেসেতা চায় যে তাকে ভিক্ষা বলা চলে না—এ যেন কামাখ্যার পাহাড়ে কুমারীদের পয়সা চাওয়া। ঐ বিশাল পর্ব্বতের তলায় জলপাইকুঞ্জে যখন ছায়া দীর্ঘতর হয়ে নেমে আসে, যখন রাখালবালক তার ছাগলগুলি নিয়ে ঘরের দিকে ফিরে যায়, গাধার গলায়-বাঁধা-ঘণ্টা শ্রান্ত স্বরে বাজতে থাকে তখন মনে হয়, এই মধ্যযুগের শহরটি এখনও পদবী ও আভিজাত্যের মর্য্যাদায় গর্ব্বিত বিচিত্র পোষাকে সজ্জিত স্প্যানিশ অভিজাতদের প্রতীক্ষা করছে—যারা সপ্তসমুদ্রের পারের দুর্গম অজ্ঞাত দেশের ভাগ্যান্বেষীদের দ্বারা আহৃত রত্ন গুয়াদিল কিভার নদীর তীরে সেভিলের বন্দর থেকে নিয়ে সম্রাট্‌কে এই ভোগবিলাসহীন প্রাসাদে অভি-বাদন করতে আসবে। চারিদিকের পাথরের বাড়ীগুলির জানালা সকৌতুকে উন্মুক্ত ক'রে নাগরিকারা চেয়ে দেখবে; গীতার-বাদ্যরতা কোন তরুণী ব্যাকুলবক্ষে নীচে নেমে এসে তার প্রত্যাশিত বীরের সন্ধানে রত কালো কাজল আঁখি একবার প্রকাশিত করেই সরে যাবে। মাণ্টার কথা মনে পড়ে। সেখানেও এমনি আঁকাবাঁকা রাস্তায় হরিণাক্ষী তরুণীরা চকিতে

চেয়ে সরে পড়ে; আর স্থিরাক্ষী গৃহিণীরা কালো রেশমী শালে ঘাড় ঢেকে বিজয়গর্ব্বে চলে যায়, বিদেশী পথিককে তারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না।

মঠের বিশাল দক্ষিণ তোরণ যেখানে সর্ব্বদা দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, রাজর্ষি ফিলিপের স্মৃতি যেখানে বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেখানে বুঝি চপলতার কল্পনাই এরা করতে চাইবে না। প্যান্থিয়ন বা রাজকবর গৃহের শবাধারগুলির মর্ম্মরের অসম্ভব রকম ঔজ্জ্বল্য হয়ত আমাদের তাজমহলকেও হার মানায়। এখানকার অন্ধকারপ্রায় ভূগৃহে পঞ্চম চার্লস থেকে প্রায় সব রাজারই শেষভস্ম রক্ষিত আছে, শ্মশানের শূন্যতায় নয়, ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতায়। এখানে একটি শবাধার দেখিয়ে গাইড বলল, "এটি রাজা আলফন্সোর জন্য ছিল; কিন্তু খাঁচায় পোরবার আগেই পাখী আমাদের কল্যাণে পালিয়ে গেছে।" এই রসিকতা করার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখদুটি চক্‌চক্ ক'রে উঠল ও মর্ম্মর-দ্যুতিতে উজ্জ্বলপ্রায় সেই ভূগর্ভে সে নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল ও বুকে ক্রুশচিহ্ন আঙুল দিয়ে এঁকে দিল। মনে মনে বুঝলাম যে সোশ্যালিজ্‌মের উপরও রাজর্ষির জয় হয়েছে।

ইতিহাসের দিক দিয়েও এখানে চিত্তাকর্ষক বস্তুর অভাব নেই। যে-বিলাসহীন কক্ষে যে-টেবিলে, যে-ঘড়ির সামনে অক্লান্তকর্ম্মী ফিলিপ সাম্রাজ্যের কাজ করতেন তা সবই তেমন ভাবে সাজান আছে। ফিলিপ ও ইংলণ্ডের রাণী মেরীর বাসরশয্যা ও শয়নকক্ষ এখনও সযত্নে সাজান আছে। রাজদূতদের আসনগুলি এখনও তাদের প্রতীক্ষা করছে। দ্বিতীয় ফিলিপের পুস্তকাগার এক সময়ে ইউরোপে অদ্বিতীয় ছিল; তিনি এর উন্নতির জন্য কম চেষ্টা ও অর্থব্যয় করেন নি। শুধু তাই নয়, চিত্রশিল্পের জন্যও তিনি ও তাঁর বংশধররা এস্কোরিয়ালের প্রাসাদে অনেক ব্যয় করে গিয়েছেন। তিৎশিয়ান, তিন্তোরেত্তো, ও ভেলাস্‌কেথ প্রভৃতির ছবিতে এই গৃহ পরিপূর্ণ ছিল। অবশ্য তার বহু অংশ অগ্নিকাণ্ডে ও নেপোলিয়নের ফরাসী সৈন্যদের দস্যুতায়

পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে ; কিছু মাদ্রিদে স্থানান্তরিত হয়েছে ; কিন্তু যা বাকী আছে তার মূল্য কম নয়।

এখানকার তিৎশিয়ানের 'শেষ ভোজন' ছবিটি, ও লুভ্‌রে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির 'শেষ ভোজন' ছবি দুটির তুলনা করবার ইচ্ছা যে-কোন চিত্ররসিকের মনে স্বতই জেগে উঠবে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পকলার উৎকৃষ্ট উদাহরণ এখানে আছে, তা হচ্ছে দেওয়ালে আঁকা সারি সারি ফ্রেস্কো ছবি—প্রেরেগ্রিন, লুই দ্য কার্বাথাল, কার্‌দুচ্চি ও লুকা জ্যোর্‌দানোর আঁকা যিশুখৃষ্টের সারাজীবনের কাহিনী। মনের মধ্যে কি করুণ ভাবে আঘাত করে ক্রশ থেকে খৃষ্টের দেহ-অবতরণের চিত্রটি। এই খৃষ্ট-জীবনীর ভাববস্তু স্পেনে কত জায়গায়, কত শিল্পীর কল্পনায়, কত বিভিন্ন ব্যঞ্জনায় দেখলাম।

সে-সব ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষী জাতি বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের আশায় মুসলমান রাজত্বকালে ভারতবর্ষে এসেছিল তাদের মধ্যে ইবেরিয়ান পেনিন-সুলার অধিবাসীরাই পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী খড়্‌গহস্ত হয়েছিল। যে ষাট বছর পোর্টুগীজরা স্পেনের অধীনে ছিল তখনও ভারতবর্ষে পৌত্তলিকদ্বেষ বিন্দুমাত্র কমে নি। আশ্চর্য্যের বিষয়, স্পেনে এসে দেখছি যে সে-যুগে এরাও কম পৌত্তলিক ছিল না। এবং এখনও এদের এ-বিষয়ে কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। সালামাঙ্কা, টোলেডো ও এস্কোরিয়ালের গীর্জ্জা দেখে বারবার ভাবি যে সাকার পূজা ক্যাথলিকদের মধ্যেও হিন্দুদের মতই কত সুন্দর ও মধুর প্রথা এনে দিয়েছে ; পূজার মন্দিরে কত ধূপগন্ধ, দীপমালা, কত চামরব্যজন, কত সন্ধ্যারতি। আমাদের মতই এদের তীর্থযাত্রা, পর্ব্ব-দিবস, আমাদের মতই প্রণতির বিচিত্র বিকাশ। খৃষ্ট, ত্রিমূর্ত্তি, পরমমাতা মেরী, এঁরা এদের দেবতা, এঁদের চিত্র বা মূর্ত্তি এদের কাছে হিন্দুর প্রতিমার মত, এঁদের জীবনকাহিনী হচ্ছে ক্যাথলিকের পুরাণ। এঁদের সামনে কত নতমস্তকে প্রার্থনা, পাপস্বীকার, অশ্রুপাত, দূর থেকে "কাটিড্রাল" দেখে কত

বিনীত ভাব ধারণ। সবচেয়ে বেশী পৌত্তলিকতা দেখলাম এস্কোরিয়ালের গীর্জ্জায়। রেনেসাঁস যুগের শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ উদাহরণগুলির অন্যতম এই গীর্জ্জাটিতে মাটি ও পাথরে গড়া মেরীর প্রতিমা আছে; তার পিছনে বন ও ঝরণার চিত্র তৈরি করা আছে, মোমবাতি ও ধূপকাঠিতে সেখানে হিন্দু মন্দিরের আবহাওয়া পরিপূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গীণভাবে বিরাজ করছে। তবে তেত্রিশ কোটি দেবতার স্থান অধিকার ক'রে আছেন একা যিশুখৃষ্ট।

সমস্ত স্পেন জুড়ে লোকের মন ভ'রে রেখেছিল এক খৃষ্টের জীবনী। ক্যাথলিক ধর্ম্ম, তার বাহন রাজতন্ত্র ও স্পেন যে অবিচ্ছেদ্য ছিল তা বারবার বুঝতে পারছি ও বিভিন্ন ভাবে প্রমাণ পাচ্ছি। দেশটার কি দুর্ভাগ্য! বড় বড় সম্রাট্ পুরাতন ও নূতন পৃথিবীর আহৃত বিপুল ঐশ্বর্য্য দেশের লোককে দরিদ্র, অনুন্নত রেখে মন্দিরের পর মন্দির নির্ম্মাণে ব্যয় করে গিয়েছেন; দেশের সাধারণ লোককে ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত রেখে উপাসনার অনুষ্ঠান ও উপকরণ-গুলিকে সোনায় মুড়ে দিয়েছেন। যাজককে যোদ্ধার উপরে সম্মান দিয়ে, ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার দাবিকে আভিজাত্যের চেয়ে বড় ক'রে দেখে, পরাক্রমশালী দেশকে নির্বীর্য্য অলস ক'রে জনশক্তির হানি ক'রে গিয়েছেন। ধর্ম্মের নামে দেশের শ্রেষ্ঠ বণিক ও কৃষক ইহুদী ও মূরকে বিতাড়িত ক'রে, স্বাধীন চিন্তাশীলতার কণ্ঠরোধ ক'রে, দেশকে ডুবিয়ে দিয়ে শান্তি লাভ করেছেন। এই এস্কোরিয়ালের গীর্জ্জায় যে সুকুমার বালকরা আজ প্রভাতে মধুর উদাত্ত কণ্ঠে উপাসনা ক'রে হরিদ্বারের পুরোহিত-বালকদের মন্দিরচত্বরে সামগানের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে, এদের জীবন সমাজ ও দেশের দিক্ থেকে কতখানি সফল হচ্ছে?

কিন্তু দেশের একটা সৌভাগ্য এই ক্যাথলিক খৃষ্টধর্ম্মের ভিতর থেকেই এসেছে। এত মন্দিরশিল্পের ও চিত্রকলার প্রসার ও উৎকর্ষ স্পেনে ক্যাথলিক ধর্ম্ম ছাড়া আর কোন প্রভাবই সম্ভব ক'রে তুলতে পারত কিনা সন্দেহ। এখানে শিল্পের একাধারে বাহন ও বিষয়বস্তু হয়েছে ক্যাথলিক ধর্ম্ম, বিশেষ

ক'রে খৃষ্টের জীবনী। রাজা ও অভিজাতবর্গ বহু সম্পত্তি দেবোত্তর করেছেন, বহু শিল্পীর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, কারণ তাঁদের মনে হয়েছে যে, শিল্পের প্রসারের মধ্য দিয়ে হবে ধর্ম্মের প্রচার। অবশ্য ইউরোপে সব দেশেই শিল্প ও রসসৃষ্টির দিক্ দিয়ে ক্যাথলিকের দান বিপুল এবং প্রটেষ্টাণ্টের চেয়ে অনেক বেশী। শিল্পের দিক্ দিয়ে প্রটেষ্টাণ্ট সৃষ্টির চেয়ে সংহারই করেছে বেশী; বাথ (Bach) ছাড়া আর কোন প্রটেষ্টাণ্ট মন্দির-সঙ্গীতকারের নাম হঠাৎ মনেই আসে না।

কিন্তু এজন্য স্পেনকে কম দাম দিতে হয় নি। অন্য কোন ইউরোপীয় রাষ্ট্র দেশে ও বিদেশে ধর্ম্মের প্রচার ও বিস্তারের জন্য এমনভাবে নিজের সর্ব্বনাশ করে নি। ফ্রান্সও ক্যাথলিক হয়েছিল, কিন্তু এমনভাবে নিজেকে রিক্ত করে নি; এ যেন সর্ব্বাঙ্গকে ক্লিষ্ট অপুষ্ট রেখে মুখের প্রসাধন। ইটালীও ক্যাথলিক ছিল ও ধর্ম্মের ভিতর দিয়ে শিল্পের উন্নতি স্পেনের চেয়ে বোধ হয় কম করে নি, কিন্তু স্পেনের মত নিজেকে ক্যাথলিক ধর্ম্মের জন্য সব কিছু থেকে বঞ্চিত করে নি। স্পেন করেছে চূড়ান্ত; তাই তার শিল্পের বিষয়বস্তুর মধ্যে পৌরাণিকতা নেই, পেগানিজম্ নেই।

কি আশ্চর্য্যের বিষয়, যে-সম্রাট্ ধর্ম্মপ্রাণতার আতিশয্যে ও ধর্ম্মপ্রচারের প্রাবল্যে তরবারির মুখে ও জ্বলন্ত ইন্ধনের প্রয়োগে (Inquisition) ক্যাথলিক ধর্ম্ম রক্ষা ও বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর নিজের শেষ জীবন ছিল একেবারে সন্ন্যাসীর মত আড়ম্বরহীন ও দুর্ব্বলের মত অসহায়। এস্কোরিয়ালের গীর্জ্জা প্রাসাদের চেয়ে বেশী সমৃদ্ধ ও সুন্দর। নিয়তির পরিহাস! শেষ বয়সের অসুস্থতার জন্য প্রাসাদের যে-কক্ষের দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে বিছানা থেকে তাঁকে 'ম্যাস' উপাসনা দেখেই তৃপ্ত থাকতে হ'ত, সেই দীনাতিদীন ঘরটিই আজ এখানে সব চেয়ে বেশী আকর্ষণের জিনিষ।

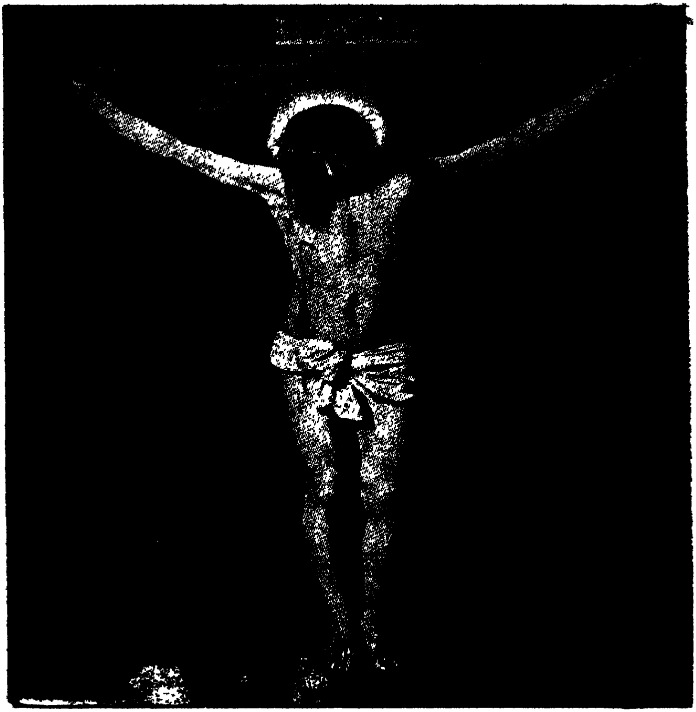
ফিলিপ ছিলেন স্পেনের ঔরঙ্গজেব।

৫

মাদ্রিদে আবার ভারতবর্ষকে মনে পড়ল। পথে পথে বেলিনের সুকঠিন সুষ্ঠ শৃঙ্খলা নেই, লণ্ডনের গতির স্রোতে ভেসে যাওয়া নেই। ৩১শে ডিসেম্বরের রাত্রে পুয়ের্ত্তা দেল সল অর্থাৎ সূর্য্যতোরণে শহরের কেন্দ্রস্থলে সকলেই নববর্ষকে যেভাবে অভিনন্দিত ক'রে নিল তার মধ্যে শুধু যে আনন্দের উল্লাসই আছে তা নয়, তার মধ্যে আছে মথুরার পথে দোলের দিনের মত হল্লা ও হুল্লোড়। রাস্তায় চলতে চলতে হিস্পানীরা বন্ধুর দল পাকিয়ে এমন-ভাবে পথ জুড়ে গল্প করবে যেন তাদের খাসদখল প্রমাণ হয়ে গেছে। এ যেন হট্টগোলের শহর; লোকের চীৎকার ছাপিয়ে ওঠে অটোম্যাটিক ট্রাফিক সিগন্যালের আলোর সঙ্গে ঠং ঠং ক'রে ঘণ্টাধ্বনি। স্পেনের সুন্দর রাজধানীটি ছোট, কিন্তু তার ঘোষণা বেশ বড।

বিদেশী পর্য্যটকের কাছে স্পেনের যে সম্মানের আসন পাওয়া উচিত ছিল তা সে পায় নি। তার কারণ প্রধানতঃ দেশের অনুন্নত অবস্থা, বাহিরে বিজ্ঞাপনের অভাব ও ভিতরে রাজনীতিক বিপ্লব। নতুবা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রশালা হিসাবে 'প্রাদো'র অঙ্গনে আরও বেশী চিত্ররসিকের সমাগম হ'ত। গোইয়া, গ্রেকো, ম্যুরিলো, ভেলাস্কেথ প্রভৃতির যথাযোগ্য প্রকাশ এখনও হয় নি ব'লে মনে করি। গোইয়ার রাজবংশের চিত্রগুলিতে যে অনুসন্ধিৎসু এমন কি ক্ষমাহীন চরিত্রের বিশ্লেষণ আছে তার তুলনা কোথায়? অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর চিরকর গ্যার্দি ভেনিসের অধঃপতনের যুগের চিত্র অঙ্কনে যে সিদ্ধহস্ততা দেখিয়েছেন, বৃহত্তর ক্ষেত্রে গোইয়া তার চেয়ে বেশী কৃতিত্বের সঙ্গে একটি গৌরবময় যুগের শেষ সন্ধ্যায় একটি অস্তমান রাজসভার চিত্র এঁকে গিয়েছেন। জগৎটা তাঁর কাছে যেন একটা প্রহসন; কখনও গম্ভীর বিদ্রূপে, কখনও সাবলীল সরলতায় তিনি সমসাময়িক স্পেনের অন্তর উন্মুক্ত ক'রে দেখিয়েছেন। খৃষ্ট-জীবনী হচ্ছে ম্যুরিলোর প্রধান বিষয়বস্তু এবং ধর্ম্মমূলক।

ইয়োরোপা



ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্ট—শিল্পী ভেলাস্‌কেথ



'ইম্যাকুলেট কন্‌সেপ্‌শন'—শিল্পী মুরিলো

এই বিষয়টিতে তিনি যে প্রাণ ও মানবের অনুভব সঞ্চার করেছেন তা ইটালীর শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের মধ্যেও দুর্লভ। 'যিশু ও সেণ্ট জন,' 'ক্রন্দনশীল সেণ্ট পিটার', 'শিশু পরিত্রাতা', 'দুঃখিনী মাতা' এদের তুলনা কোথায়? প্রাদোতে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করে পাশাপাশি সাজান দুটি ইম্যাকুলেট কন্‌সেপশ্যনের চিত্র; একটি কৃষ্ণকেশিনী, অপরটি কনককেশিনী। এ দুটি গভীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করলে ম্যুরিলোর শিল্পের বিবর্ত্তনের ধারা কিছু বুঝতে পারা যায়। দ্বিতীয়টিতে একাধারে রিবেরার বর্ণচাতুর্য্য, ভ্যান ডাইকের মাধুর্য্য ও ভেলাস্‌কেথের বাস্তব প্রাণময়তার সমাবেশ ও সমন্বয় দেখতে পাই। ত্রস্তা ব্যাকুলচিত্তা কুমারীর মধ্যে স্বর্গের পারিপার্শ্বিকতা সত্ত্বেও দেবীসুলভ রূপ নয়, আদর্শের প্রভাব নয়, মানবের অনুভবই বেশী আত্মপ্রকাশ করেছে। তা ছাড়া প্রাদোতে ম্যুরিলোর চিত্রগুলিতে জনতার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করার যে কৌশল দেখলাম তা পৃথিবীতে অতুলনীয় ব'লে আজকাল স্বীকৃত হয়েছে।

ক্রীটের সন্তান এল্ গ্রেকোর শুধু একটি মাত্র চিত্র—'কাউণ্ট অগার্থের কবর'—এতে হিস্পানী জাতীয় চরিত্রে মাধুরী ও চঞ্চলতা, ছলনশীলতা ও তীব্র অনুভূতির যে সবল প্রকাশ পাই তা কোন স্প্যানিশ চিত্রকরও দেখিয়েছেন কি না সন্দেহ।

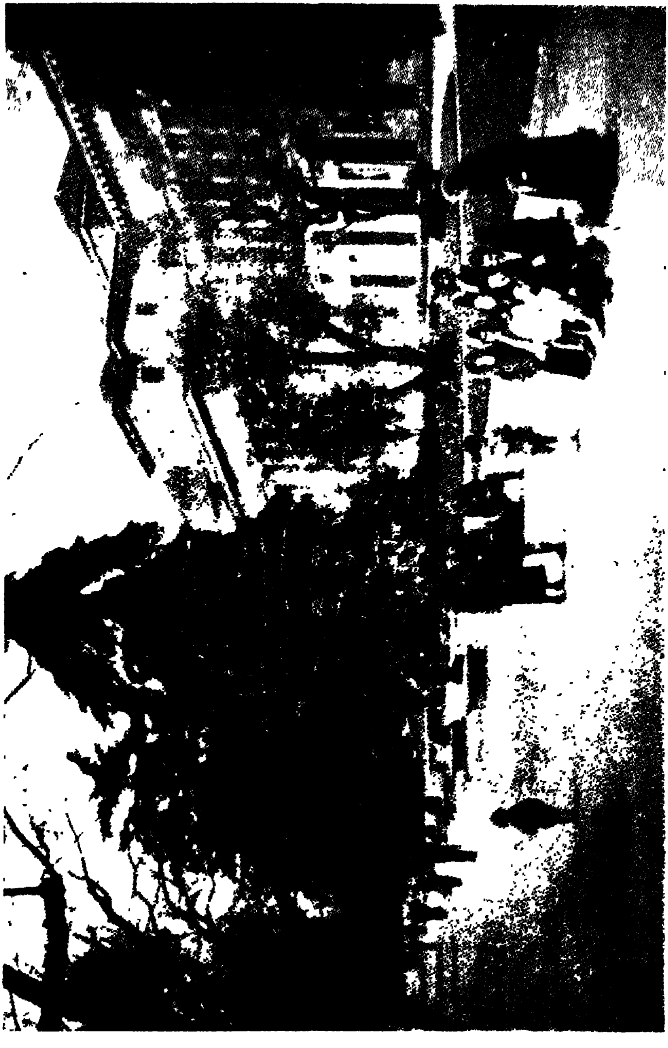
আশ্চর্য্যের বিষয়, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী ভেলাস্‌কেথের (১৫৯৯-১৬৬০ খৃষ্টাব্দ) নাম উনবিংশ শতাব্দীর আগে খুব কম বিদেশীই জানত, অথচ তার ক্রুশবিদ্ধ খৃষ্টের ছবিটি খৃষ্ট-সম্বন্ধীয় সব ছবির মধ্যে নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠ। খৃষ্ট-জীবনীর চিত্রচয়নিকায় এটি না থাকলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তার পর, 'লাস মেনিনাস' অথবা 'দি ফ্যামিলি' নামক চিত্রটি স্বাভাবিক প্রতিকৃতির জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম চিত্র ব'লে স্বীকৃত হয়েছে। এতে যে সম্ভ্রম, শক্তি ও মাধুর্য্যের পরিচয় পাই তা শিল্পীর নিজের জীবনের চিন্তালেশহীন শান্তির আভাস দেয়। সার্ টমাস লরেন্সের কথা মনে পড়ে—যা আঁকতে চাওয়া

হয়েছিল তার এমন নিখুঁত সাফল্য এতে আছে যে এই ছবিকে আর্ট অব ফিলজফি বলা যায়। লুকা জ্যোর্দানো এর যে প্রশংসা করেছিলেন তার অনুবাদ করা চলে না—এই ছবিটি হচ্ছে থিওলজী অব পেন্টিং।

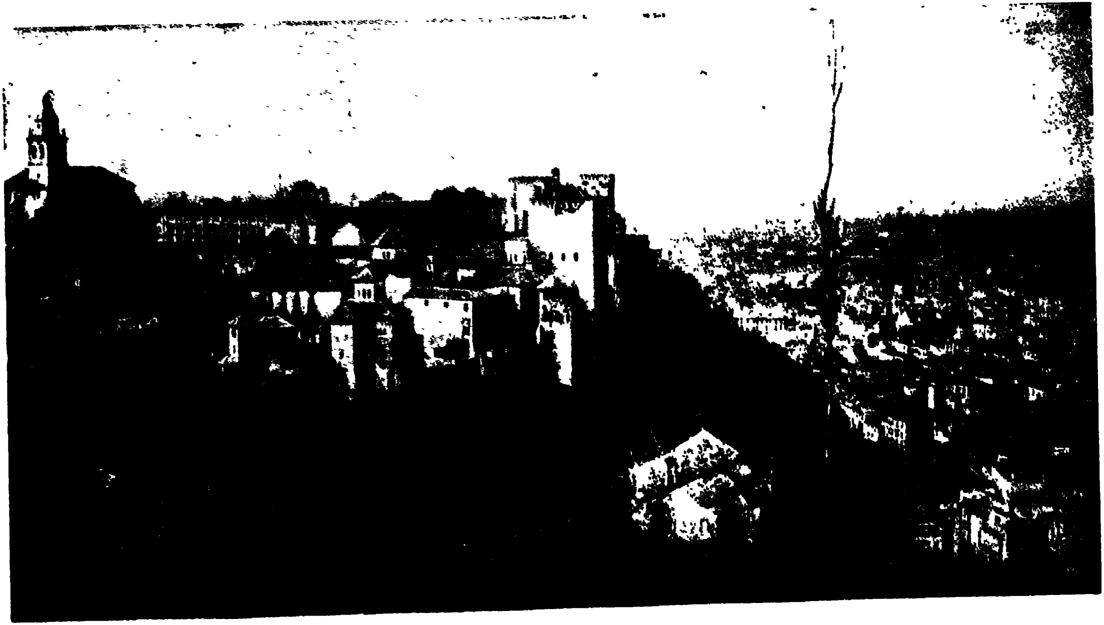
স্পেন অ-ক্যাথলিক ধর্ম্মের উপর যত অত্যাচার করেছে, সৌভাগ্যের বিষয় অ-ক্যাথলিক শিল্পের উপর তত করে নি। সেই জন্য সালামাঙ্কা ও সেভিলের গীর্জ্জার মিশ্র কারুকার্য্যের চমৎকার মনোহারিত্ব অক্ষুণ্ণ আছে—যার আবেদন শিল্পের ছাত্রের চেয়ে রসিকের কাছে বেশী। সেই জন্য সেভিলের 'আলকাথার' রাজপ্রাসাদও এত সুন্দর মনে হয়। কিন্তু স্পেনের খ্রীষ্টধর্ম্ম কর্দোভার 'মেথকিতা'কে অক্ষুণ্ণ সৌন্দর্য্যে থাকতে দেয় নি। আবদার রহমানের এই অনুপম মসজিদটি বিশালতায় রোমের সেণ্ট পিটার্সের পরেই ও সেভিলের গীর্জ্জার সমান। অপরূপ শ্বেতলোহিত খিলানের এই মস্‌জিদের ভিতরেই একটি উচ্চ বেদী ও অন্যান্য খ্রীষ্টান স্তম্ভ বসান হয়েছে। সেজন্য সম্রাট্ পঞ্চম চার্লস্ ভর্ৎসনা ক'রে বলেন, "তোমরা এখানে যা নির্ম্মাণ করেছ তা অন্য যে-কোন জায়গায় করতে পারতে; এবং পৃথিবীতে যা অতুলনীয় ছিল তা তোমরা ধ্বংস করেছ।" ৪৭০০ সুরভি তৈলের দীপে আলোকিত স্বর্ণ ও স্ফটিকের স্তম্ভময় মেহ্‌রাবের নিকটে উনিশটি তোরণ দিয়ে মূররা যখন উপাসনা করতে আসতেন, তখন সে দৃশ্য কি হ'ত তা আজ শুধু কল্পনাই করা যায়।

৬

স্পেন হচ্ছে উৎসবের দেশ। এর পথে ঘাটে বর্ণ-বৈচিত্র্য, মনোভাবের বিকাশ ও অন্তরের বহির্মুখী উল্লাস। সেভিলের রাজপথের প্রাণবান্ ও বৈচিত্র্যময় দৃশ্যের বহু চিত্র ও বর্ণনা আমরা পাই। এমন কি এই বিশেষত্ব গীতিনাট্যের সুরেও ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। মোৎসার্টের 'ফিগারো' ও 'ডন জোভান্নি,' রস্‌সিনির 'বারবিয়ের দি সিভিল্যা' ও বিৎসের 'কারমেন'



মাদ্রিদের প্রসিদ্ধ ভ্রমণপথের নিকটবর্তী বিখ্যাত প্রাদো মিউজিয়ম



হাম্‌ব্রা-প্রাসাদ, গ্র ...

ঐশ্বর্য্যে ও কারুকার্য্যে এই প্রা দ শাহজহানের আগ্রা-দুর্গের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়

গীতিনাট্যের বিচিত্র পোষাকে সজ্জিত নাগরিক ও গ্রামবাসীদের পৃথিবীর দ্বিতীয় বিশাল গীর্জ্জাটির চিত্রপটের সামনে এখনও দেখতে পাওয়া যাবে। মাদ্রিদের সমাজের সুকঠিন নিয়মনিষ্ঠা, বার্সিলোনা ও ভ্যালেন্সিয়ার অবসরহীন বণিক্‌সভ্যতা ও বিপ্লবের সূচনাকেও ছাপিয়ে ওঠে হিস্পানীদের উৎসব প্রবণতা। বিশেষ ক'রে সেভিলে যে গ্রামবাসীরা ষাঁড়ের লড়াই বা মেলা বা তামাসা দেখতে আসে তারা বিচিত্র প্রাচীন প্রথা, উজ্জ্বল বর্ণসমৃদ্ধ পরিচ্ছদ ও রসিকতা এবং মার্জ্জিত ব্যবহারে সূর্য্যকরোজ্জ্বল ঐতিহাসিক আন্দালুসিয়াকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে। সেভিলের মত এত উৎসব আর কোথাও হয় না; বিশেষতঃ ঈষ্টারের সময়। প্রাচীন সেভিলের আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ গলিপথে মূরীয় ছাপ এখনও দেখতে পাওয়া যায়; সাধারণ হোটেলের ভোজনশালাটিও মূরীয় কারুকার্য্যে সজ্জিত থাকবে। সে গলিপথের ভিতর দিয়েই যে-সব ট্রাম যাচ্ছে, তার পাশেই যে বিস্তৃত সুন্দর 'পাশিও দি লস্ দিলিথিয়াস্' নামে 'বুলভার' রয়েছে সেগুলি যেন অলীক। সেভিলের আরব বণিক্ কৃষ্ণ পোষাকাবৃত সন্ন্যাসী ও উৎফুল্ল প্রশংসাগর্ব্বিত 'মাতাদোর'দের সঙ্গে সেগুলি খাপ খায় না একটুও।

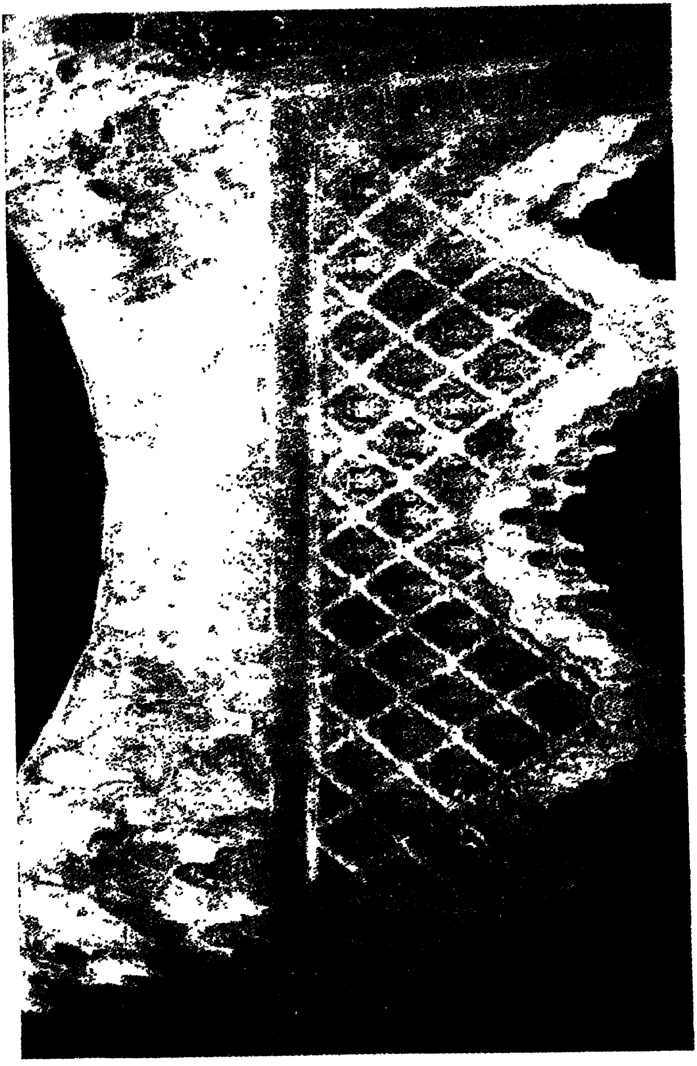
গ্রানাডার 'আলহাম্ব্রা'তেও ঠিক এমনি একটা আভাস পাই। ঐশ্বর্য্য ও কারুকার্য্যে আলহাম্ব্রা প্রাসাদ শাহ্‌জহানের আগ্রা-দুর্গের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু এ আরও বেশী প্রাচীন; কালের আঙুলের ছাপ একে আরও যেন বেশী অননুভূত আকর্ষণ দিয়েছে; আর জেনারিলিফে উদ্যানের মত কোন উদ্যান আগ্রা-দুর্গে নেই। অনবদ্য মূরীশ কারুকার্য্য-খচিত এই প্রাসাদটি যে পাহাড়ের উপর তা যেন এই স্পেনের মধ্যে নয়; এর চারি দিকের অলিন্দ থেকে যে ধূসর দৃশ্য দেখা যায়, "নিত্য-তুষারা" যে সিয়েরা নেভাদা চিরকালের প্রহরীর মত সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে, আর পর্ব্বতগুহায় যে জিপ্সিরা বাস করে তারাই যেন এখানকার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সত্য; আর বাকী সবই অলীক। সৌভাগ্যের বিষয়, স্বল্পালোকিত প্রস্তরবন্ধুর গিরিপথ দিয়ে এখানে উঠে আসতে

হয় ; বিংশ শতাব্দীর মোটর গাড়ীর রূঢ় আত্মঘোষণা আলহাম্ব্রার সান্ধ্য তন্দ্রাটি ভঙ্গ করে না।

এদের প্রাত্যহিক জীবনে একটা চিন্তাহীন উল্লাস ও আন্তরিক উচ্ছ্বাস আছে যা দেখে স্পেনের বিপ্লববাদ ও সংঘর্ষকে সত্য ব'লে মনে করা কঠিন। বার্সিলোনার 'রামব্লা' রাজপথে 'প্লেন' গাছের ছায়ায় বন্ধু-বান্ধবীর দল হাস্যমুখে কৌতুক-পরিহাসের মধ্যে যেরূপে বেড়ায় তাতে দৈনিক খবরের কাগজের বার্সিলোনা বলে মনে হবে না। প্যারিসের শাঁজেলিজে রাজপথের সভ্যতার কৃত্রিমতা এখানে নেই। এরা এত সহজভাবে বিদেশীকে বন্ধু ক'রে নিল যেন এই রাজপথে ও ভ্যালেন্সিয়ার উৎসবের মেলা 'ফেরিয়া'তে কোন প্রভেদ নেই। পথে পথে রৌদ্রের আভায় সুন্দর কমলাকুঞ্জ অন্তরের দ্বার মুক্ত ক'রে দিল, আর স্পেনের আন্তরিকতা অভ্যর্থনায় পরকে আপন ক'রে নিল। এমনই আন্তরিকতার সঙ্গে প্রাদোতে একটি শিল্পী তার বহু যত্নের ইম্যাকুলেট কনসেপ্‌শনের প্রতিলিপির জন্য একটি অজ্ঞাত বিদেশীর কবিতা গ্রহণ করেছিল :—

তোমরা আঁকিয়া যাও ক্ষণিকের ভাবনা বিকাশ
অসীমের একটু কণিকা,
আমরা রাখিয়া যাই চিরদিন হৃদয়-উচ্ছ্বাস
প্রাণে পাই সুন্দরের লিখা ;
কত কথা কয়ে ওঠে তূলিকার নীরব ভাষায়
তোমাদের কল্পনার ছায়া,
আমরাও দেখি তাই বার-বার আনন্দে আশায়
যে স্বপ্ন লভেছে হেথা কায়া।

ইয়োরোপা

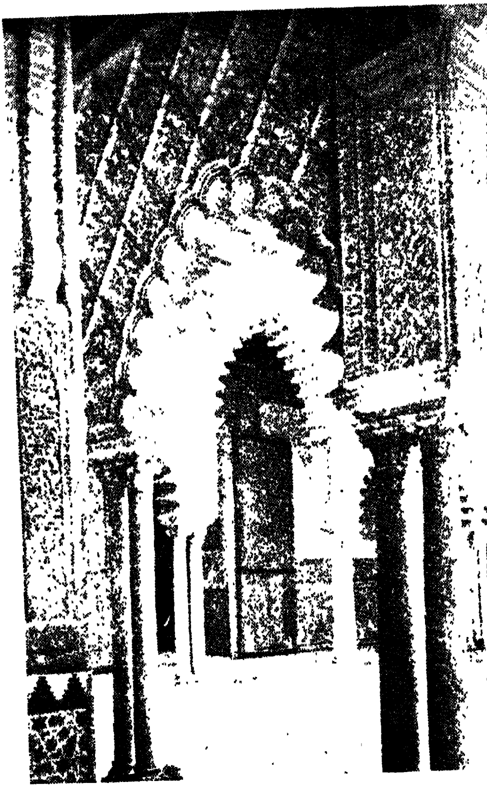


স্বর্ণ কঙ্কণ অলঙ্কার



ক্যাষ্টিল-প্রদেশের বেশে সজ্জিতা রমণী

ইয়োরোপের অন্যদেশগুলি অতীতকে বাঁচিয়ে রেখেছে, কিন্তু স্পেন অতীতের মধ্যেই বেঁচে আছে। তাদের উদ্দেশ্য অতীতকে সাজিয়ে রাখা গৌরব অনুভব



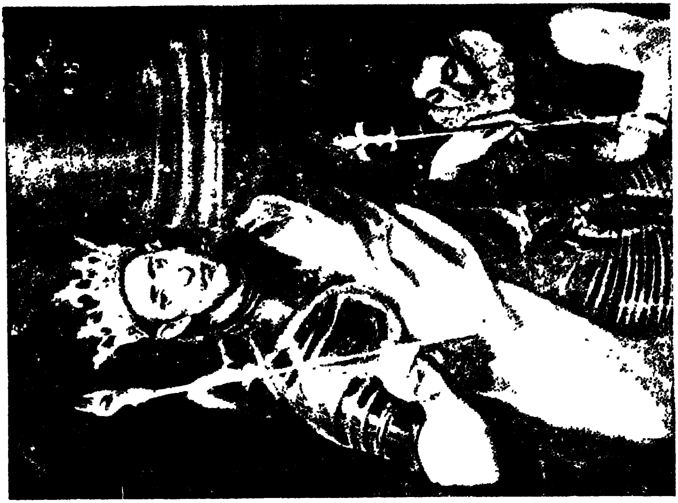
আলকাথারের কারুশিল্প

করবার জন্য, বর্ত্তমানকে দেখাবার জন্য ও বিদেশীকে দেশে আর্কষণ করবার জন্য। স্পেন নিজেই হচ্ছে অতীতের মুখর প্রতীক, মূক সাক্ষীমাত্র নয়; তার

মধ্যে সে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করে, বর্ত্তমানকে মিশিয়ে দেয় ও স্বদেশের প্রাচীনরূপটির আভাস দেয়। স্পেনের অতীত যেন নিজের জন্যই বেঁচে আছে ; লোকদেখানর জন্য নয়। বিদেশী পর্য্যটকের জন্য সে এতদিন ব্যস্তও ছিল না। মাত্র কয়েক বৎসর থেকে বিদেশীর দৃষ্টি পড়েছে তার দিকে দেশ-ভ্রমণ ও অবসর বিনোদনের জন্য। ইয়োরোপের সব দেশেই বাহিরের দর্শক আকর্ষণ করতে টুরিষ্ট এজেন্সী সৃষ্টি হয়েছে বহু বহু বর্ষ থেকে ; কিন্তু "পাত্রো-নাতো ন্যাথনাল দেল তুরিস্‌মো", বেশী দিনের প্রতিষ্ঠান নয়।

জীবনের সব বিকাশের মধ্যেই অতীতের অস্তিত্ব ও দাবী আর সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠতে চায়। বিভিন্ন প্রদেশগুলি এখনো তাদের চারশত বৎসর আগে হারাণ প্রাচীন স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়ে এক দেশ হতে চায় না। সেজন্য স্পেনের অমর বীর রাজা ফার্ডিনান্ত ও রাজর্ষি ফিলিপের চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষাকে এরা ব্যর্থ করে দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়। ফিলিপ সমগ্র স্পেনকে এক ধর্ম্মরাজ্যে বাঁধবার চেষ্টায় প্রদেশগুলির আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা কৌশলে যে হরণ করে-ছিলেন সেকথা এদের অন্তরে দাবানলের মত জ্বলে স্পেনের প্রতি তার বিরাট্ দানের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করে দিয়েছে। বিশেষ করে ক্যাটালান প্রদেশগুলি তাদের রাজনীতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে স্পেনের রাষ্ট্রতন্ত্রের ভাঙ্গন এখান থেকেই আরম্ভ হবে। লণ্ডন ও প্যারিস ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যত-খানি মাদ্রিদ স্পেনের ঠিক ততখানি নয়। বার্সিলোনা, সেভিল ও ভ্যালেন্সিয়া মাদ্রিদের সঙ্গে অনেক বিষয়ে পাল্লা দেয়। রাজনীতিক প্রভাব ও প্রতিষ্ঠার জন্য বার্সিলোনা শুধু স্পেনের বোম্বাই হয়েই ক্ষান্ত নয় ; তার চিন্তা ও গতি স্বতন্ত্র ; মাদ্রিদকে সে উপেক্ষা করতেও পশ্চাৎপদ নয়। কাজেই মাদ্রিদ স্পেনের রাজধানী বললেই সবটুকু বলা হয় না। তাকে এখনো সহর (Ciudad-থিউদাদ) বলে স্বীকার করা হয় নি, সে হচ্ছে শুধু villa.

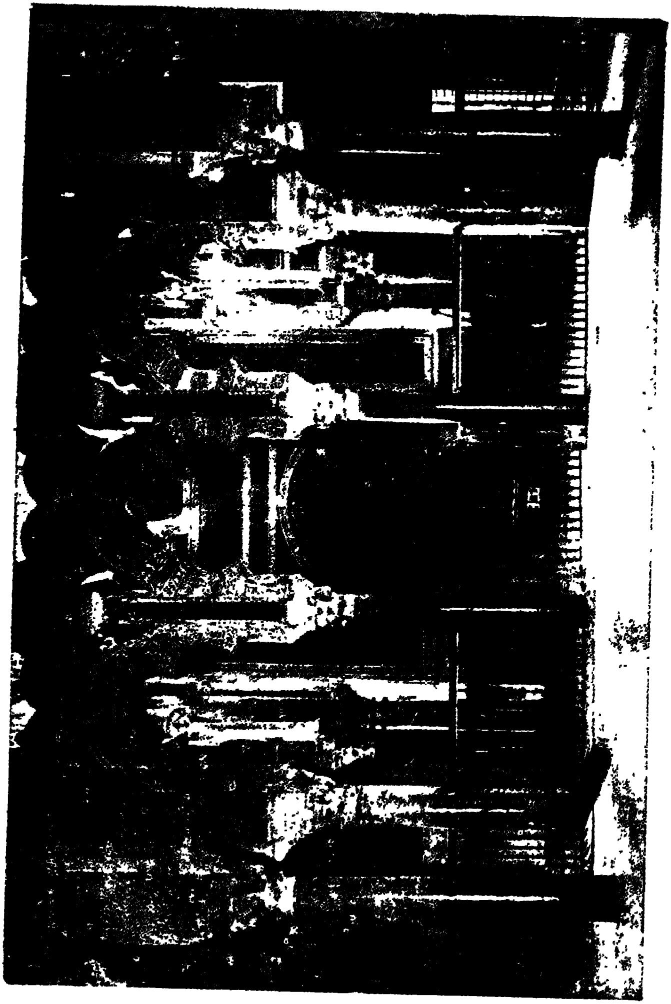
সার্থকনামা কিন্তু এই ভিলা। এর চারদিকের গিরিশ্রেণীশোভিত পারি-পার্শ্বিক দৃশ্য এত সুন্দর যে ভিয়েনা ছাড়া কোথাও বুঝি তার তুলনা মিলে না।



রাজা ফা … শিল্পী এল গ্রেকো



কাউন্ট অর্গাজের কবর-চিত্রের একাংশ—শিল্পী এল গ্রেকো



কর্ডোবা মসজিদের মেহরাব



আলজ র পথে

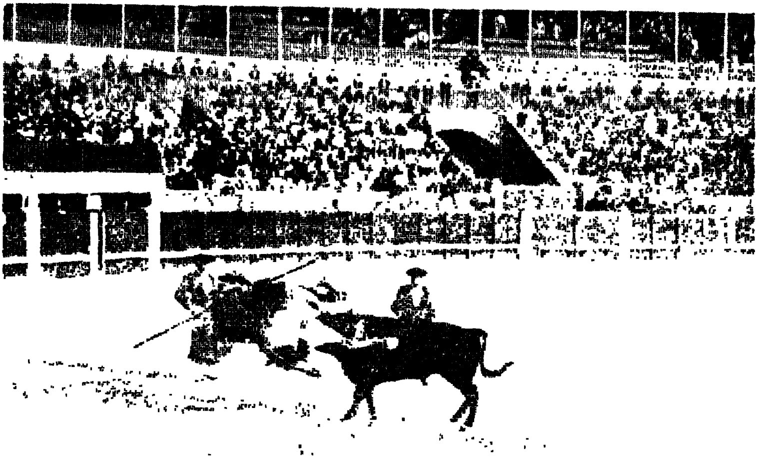
কথায় বলে ভিয়েনা পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সঙ্গীত, উত্তরে নৃত্য ও দক্ষিণে প্রণয় দিয়ে ঘেরা। মাদ্রিদ সম্বন্ধেও ওই রকম কোন প্রবাদ রচনা করলে প্রবাদের সার্থকতা হ'ত। সবদিকে সৌন্দর্য্য দিয়ে ঘেরা এই সহর; রাজপ্রাসাদ থেকে যে দৃশ্য দেখা যায় তাতে একটি ছোট জনাকীর্ণ রাজধানীতে আছি একথা বিশ্বাস করা কঠিন। পার্সিও দেল প্রাদোর রমণীয় রাজপথে বেড়াতে বেড়াতে একে মোটেই কোলাহলমুখর, ট্রেড ইউনিয়ন সঙ্কুল শহর বলে মনে হয় না। এখানে যত শ্রমিকসংঘ ও সমাজবাদীসংঘ আছে রাশিয়া ব্যতীত আর কোন দেশের সহরে বোধ হয় এত নেই। সহরের উপকণ্ঠেই সেনাশিবির, পল্লীর পথকে কলিকাতার মেছুয়াবাজার বলে ভ্রম করলে বিশেষ ভুল হবে না। তবে এসহর বিরামের অমরাবতী, চিত্তপ্রসাদের প্রমোদকানন। ব্যাঙ্ক পল্লী ভিন্ন



অশ্বতরযান

আর কোথাও উদ্দামগতির ঔদ্ধত্য বা ব্যস্তবাগীশতার চিহ্ন নেই। এই ভোজন-বিলাসীর তীর্থে সাধারণ হোটেলেও নয় পর্ব্বের ভোজন উপভোগ করতে করতে কতবার মনে হয়েছে লণ্ডনের পরিবর্ত্তে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হলেই

ভাল হ'ত। তাহলে লণ্ডনের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যরাত্রিতে নববর্ষকে উদ্দাম নৃত্য দিয়ে অভিনন্দন করার দৃশ্য দেখতাম না; বারটি ঘণ্টাধ্বনির প্রত্যেকটির সঙ্গে এক একটি আঙ্গুর মুখে দিয়ে নববর্ষকে অমনই সুন্দর সরসভাবে উপভোগ করবার স্বপ্ন দেখতাম।



বুল-ফাইট

ইয়োরোপের বর্ত্তমান সভ্যতার বিকাশের প্রথম লক্ষণ দেখি বাহিরের পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞানাহরণের চেষ্টায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর বিরাট্ স্বর্ণময় কল্পনার কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়েছিল ভারতবর্ষ। তাকে আবিষ্কারের চেষ্টা ও তার ফলে আমেরিকা আবিষ্কার হচ্ছে স্পেনের ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে শ্রেষ্ঠদান। এ যে কত বড় তা একথা মনে করলেই বুঝা যাবে যে বর্ত্তমান পৃথিবীই হচ্ছে ইয়োরোপের আবিষ্কার ও মানবসভ্যতাকে দান। আমাদের সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা সম্বন্ধে একটা চমকপ্রদ ধারণা ছিল বটে; পেরুতে রামলীলার মত উৎসব বা মেক্সিকোতে গণেশমূর্ত্তির মত মূর্ত্তি প্রাপ্তির উদাহরণ দেখিয়ে ভারতবর্ষ থেকে আমেরিকা

গমনাগমন প্রমাণের চেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু এসবের দাম ব্যবহারিক বিজ্ঞান-সম্মত ভৌগোলিক জ্ঞান হিসাবে কিছু নয়। শুধু আমেরিকা আবিষ্কারের স্মৃতিই ইয়োরোপকে কলম্বস তথা স্পেনের কাছে চিরকৃতজ্ঞ রাখবে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে হিস্পানীদের চেয়ে বেশী দুঃসাহসী অভিযানে যেতে কেহ পারে নি; সমস্ত পৃথিবীতে ধনরত্ন আহরণ, সুচারুরূপে সাম্রাজ্যগঠন ও শাসনব্যবস্থা করতে স্পেন ছিল অতুলনীয়। পোপের নির্দ্দেশ অনুযায়ী নূতন আবিষ্কৃত পৃথিবীকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই ভাগে পোর্টুগালের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল এবং এই একমাত্র প্রতিদ্বন্দী পোর্টুগালকেও ষাট বৎসর নিজের অধীনে রেখে দিয়েছিল। আর্মাডাধ্বংসের ও ওলন্দাজ স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত স্পেনের সমরপটুতা অতুলনীয় ছিল। স্পেনের সে দিনও নেই, সে গৌরবও নেই। তবু লোকের মন বিপুল ধনসাম্রাজ্যের অধিকারীরই মত দিলদরিয়া আছে এখানো। এদেশের সাধারণ লোকের কথায় কথায় রাজা-উজির মারাটা ঠিক নিষ্ফল বাগাড়ম্বরের মত হাস্যস্কর শুনায় না; এ যেন অতীতের স্মৃতির করুণ ঝঙ্কার।*

বর্ণসমস্যা স্পেনে কখনো ছিল না, এখনো নেই। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইহুদি ও মূরের প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার হয়েছিল তার মূলে ছিল ক্যাথলিক ধর্ম্মান্ধতা, বর্ণ নয়। ফ্রান্স যে রকম আফ্রিকান ফরাসী প্রজাকে সৈন্যদলে স্থান ও দেশের প্রধান মন্ত্রী বা সেনাপতি হবার পর্য্যন্ত আইনগত অধিকার দিয়েছে, স্পেনও তাই দিয়েছে। আফ্রিকাতে স্পেনের বিরাট্ সৈন্যদল আছে। স্পেনে যে কোন অশ্বেতকায় ব্যক্তি উদ্ধত কৌতূহল বা আঘাতপ্রবণ মন্তব্য না জাগিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে পারে। নিগ্রো শ্বেত-কায়ার সঙ্গে অবাধে নাচতে পারে, তার সঙ্গী হতে পারে। তাতে কোন

* ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটী অসপূর্ণভাবে লিখিত অধ্যায়ের প্রচুর উপকরণ সেভিলের Archivos des Indios এ আছে। এমন কোন স্পানিশ ও পোর্টুগীজ-জানা ভারতীয় ঐতিহাসিক কি নেই যিনি এগুলি থেকে জ্ঞান আহরণ করে অধ্যায় অসম্পূর্ণ করতে পারেন?

গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয় না। কিন্তু এতে স্পেনের বিপদও হয়েছে সমূহ। ল্যাটিন আমেরিকায় একটি বর্ণসঙ্কর জাতি উদ্ভূত হয়েছে যারা হিস্পানী চরিত্রের দোষগুলি বেশ তীব্র মাত্রায় পেয়েছে। স্পেনের অধঃপতনের একটি ঐতিহাসিক কারণ জাতীয় বিশুদ্ধি রক্ষা না করা। তার প্রাচ্য সাম্রাজ্য ধ্বংসেরও একটি প্রধান কারণ এইখানে।

নিজেকে একদিনের জন্যও অপরিচিত বিদেশী বা অপ্রত্যাশিত অতিথি মনে হচ্ছে না। বিদেশী এদের দেশে অবহেলিত না হয়, অসুবিধায় না পড়ে সে প্রয়াসের পরিচয় কতবার পেয়েছি। সালামাঙ্কায় যখন শেষ রাত্রে পৌছানর পর সহসা তুষারপাতের জন্য দূরবর্ত্তী হোটেলে যাওয়া হল না বলে ষ্টেশনের ক্যান্টিনে কফির গ্লাস হাতে করে গুলের আগুনের ধারে বসে রাত কাটিয়ে দিতে হল, তখন এই বিদেশীকে সঙ্গ দিবার জন্য গৃহস্বামী ও স্বামিনী তুষারপাতের রাত্রে তপ্ত শয্যার আহ্বান উপেক্ষা করে গল্প ও হাস্যকৌতুকে বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দিল। সহরের প্রাচীনতা ও দর্শনযোগ্যতা সম্বন্ধে তারা উপভোগ্য গল্প করে যেতে লাগল। যে দূর বিদেশী এতদূর থেকে সালামাঙ্কার গীর্জ্জা ও বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে এসেছে সে যাতে এগুলি সম্বন্ধে খুব ভাল ধারণা নিয়ে যেতে পারে সে জন্য তাদের কত বর্ণনা ও চেষ্টা! সেভিলে মাত্র পথের আলাপে একটি আইনের ছাত্র বিদেশী ছাত্রকে আত্মীয়ভাবে সঙ্গ দিল, সারাদিন আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর সহর, 'ডন কিখতে'র (Don Quixote) লেখকের স্মৃতি-সরোবর, ঐশ্বর্য্যময় রাজপ্রাসাদ আলকাথার (Alcazar) দেখিয়ে বেড়াল ও সন্ধ্যাবেলা নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করতে চাইল। গ্রাণাডা থেকে কর্দ্দোভার দীর্ঘ মটরপথে জলপাইকুঞ্জে ঢাকা পর্ব্বতের সানুদেশে ঘুরে ঘুরে মটর চলার সময় সব আরোহীর সঙ্গে কত আলাপ হয়ে গেল, যার মাধুর্য্য ও আন্তরিকতা মনে ছাপ না রেখে পারে না। অথচ কত রকমের ও কত ভিন্ন ভিন্ন স্তরের শিক্ষার লোক সেখানে ছিল। কত সময় কত শিক্ষিত ভদ্রলোক—বেকার নয়—অযাচিত ভাবে সঙ্গ দিয়াছেন, নানা দ্রষ্টব্য

দেখিয়েছেন, যেন কত দিনের পরিচয়। ভ্যালেন্সিয়া থেকে বার্সিলোনার ট্রেন যখন নীল ভূমধ্যসাগরের জলে বিধৌত প্রস্তরবন্ধুর অনুপম দৃশ্যের মধ্য



একটি হোটেলের ভোজনশালা

দিয়ে যাচ্ছিল তখন বার্সিলোনার একজন প্রতিষ্ঠাবান্ গায়ক মনের আবেগে গান শুনিয়ে দিলেন "হে 'morena' বাদামী বর্ণের বন্ধু আমার"। অনেক দেশে পেয়েছি ব্যবহারিক ভদ্রতা, এখানে পেলাম আন্তরিক সহৃদয়তা।

বিশেষভাবে ভারতবাসীর পক্ষে স্পেনকে ভাবজগতেও আপনার বলে ঠেকে। এখানে মনের হাসি অধরপ্রান্তে মিলিয়ে না গিয়ে ঝিক্‌মিক্ করে



শেষ ভোজন—শিল্পী তিৎশিয়ান এস্কোরিয়ালের চিত্রশালা

আত্মপ্রকাশ করে। কেহ বিরক্তিকে ভদ্রতায় ঢেকে 'ঢ্যাট্‌স্ অল্‌রাইট' বলে বসে না, অথচ ভারতবর্ষের মত, আন্তরিকতার বড়াই করে হাজার অপ্রিয়

কথা মুখে প্রকাশ করে ফেলে না। এদের সামাজিকতার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ভদ্রতা আছে, যা অন্তরকে আকৃষ্ট করবেই। শুধু কি তাই? সময়ে অসময়ে



শেষ ভোজন—শিল্পী দা ভিঞ্চি অঙ্কিত চিত্রখানি

প্রবাসী মন অসতর্ক মুহূর্তে নিজের দেশে ছুটে আসবার সুযোগ পায় এমনি একটা চিত্রপটের সামনে সে মন জেগে থাকে। যে অশ্বতরযান ধূলিধূসরিত

রাজপথে দাঁড়িয়ে আছে অকারণে, যে জনতা হাতে মুখে ভাবের অভিব্যক্তি দেখিয়ে সোরগোল করছে, পথে যেতে যেতে সহসা যে ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি মেঘের আভাস ছড়িয়ে ও যে আঁখি-তারকা বিদ্যুৎ হেনে যাচ্ছে সে সব মিলে মনকে উতলা করে তুলে, ছয় হাজার মাইল দূরত্বকে নিমেষে লোপ করে দেয়।

দিকে দিকে এই জাতির উৎসবপ্রবণতার প্রমাণ পাই। এবং আর কোন দেশ বোধ হয় উৎসবের দিক্ দিয়ে প্রাচীন ও নবীন উভয়কেই এমন ব্যাপক-ভাবে গ্রহণ করেনি। এ হিসাবে আমাদের দেশের অবস্থা অতি শোচনীয় হয়ে উঠছে। পশ্চিমের ভাবস্রোতের আবর্ত্তে পড়ে আমরা নিজেদের প্রাচীন উৎসবগুলি হারাচ্ছি বা বিতৃষ্ণার চোখে দেখছি, যথা দেশের রং আমাদের মনে কোন রং লাগাতে পারছে না। অন্যদিকে আমরা সব পাশ্চাত্য আমোদ প্রমোদও গ্রহণ করতে পারব না; যথা বলরুমের নাচকে তার আনন্দদায়ক সামাজিকতা ও বহুকে সে আনন্দের প্রত্যক্ষ অংশীদার করার শোভনতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ গ্রহণ করতে পারবে না। এই রকম আরো বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তার বিপক্ষে সিনেমা, ফুটবল প্রভৃতির কথা তোলা যেতে পারে। কিন্তু আমি শুধু যে-অনুষ্ঠানগুলি সমাজের সকলকে আনন্দের মধ্যে টেনে আনে তাদের কথাই এখানে বলছি। এ হিসাবে স্পেন অনেক সজীব ও সক্রিয়; পুরাতন উৎসবগুলি একটুও ত্যাগ করেনি এবং নূতনগুলিকেও সাদরে গ্রহণ করেছে। Zazz-এর প্রচলন খুব বেশী হয়েছে, তাবলে Castinet-কে কেহ ফেলে দেয়নি। বিখ্যাত ও বহুপ্রাচীন 'বুল-ফাইট' বর্ত্তমানকালের রুচি অনুসারে নিষ্ঠুর মনে হবে বলে তাকে কিছু পরিবর্ত্তন করে নিয়েছে। কিন্তু 'টরসে'র নামে এরা আগেকার মতই উল্লসিত হয়ে উঠে; 'মাতাদোর'-সম্মান অভিজাত মহলেও এখনো অক্ষুণ্ণ আছে। শ্রেষ্ঠ বৃষযোদ্ধার সম্মান কোন সেনাপতির চেয়ে কম নয়। অভিজাত সুন্দরীরাও এদের সঙ্গে পরিচয় রাখতে উৎসুক ও আলাপ করে উৎফুল্ল হন। আর একটি জাতীয় উৎসব হচ্ছে বার্ষিক মেলা ("ফেরিয়া")। এই মেলাগুলির মধ্যে স্পেনের

প্রাণের যে পরিচয় পাই তা ভারতবর্ষের খুব কাছাকাছি এসে পৌছায়। নাগরদোলাটি পর্য্যন্ত ঠিক আছে; আর আছে সেই ধূলিধূসর, কোলাহলমুখর জনাকীর্ণ পথে দ্রব্যসম্ভার। সব জুড়ে আছে প্রাণের বিচিত্র উল্লাস, প্রচুর, বর্ণসমৃদ্ধ ও আড়ম্বরময়। দুর্লভ আরবী গন্ধদ্রব্য থেকে মূরীয় কারুকার্য্যখচিত সূক্ষ্ম ছুরিকা পর্য্যন্ত যা কিছু মধ্যযুগ সম্বন্ধে রোমান্টিক, কল্পনাকে চঞ্চল করে তুলতে পারে তার সবই এখানে সুরুচিপূর্ণভাবে সাজান দেখতে পাওয়া যাবে।

জীবনের স্রোত এদেশে গভীরতার চেয়ে প্রসারের খাতেই বইছে বেশী। নারী-প্রগতি এদেশে আগে খুব বেশী দূর এগোয় নি। এমন কি পর্দ্দা না থাকলেও অভিজাত ও দরিদ্র সম্প্রদায় ভিন্ন অন্যান্য শ্রেণীতে নারীজীবন বহুভাবে অবরুদ্ধ ছিল। তখনকার দিনের আধুনিকাদের ভাগ্যে নিন্দা ও সামাজিক অসুবিধার ভয় ছিল খুব বেশী। যুগলনৃত্যের প্রচলন ছিল খুব কম। ইয়োরোপে সব দেশেই এ যুগে নারী হয়েছে স্বাধীনা আর নারীজীবন হয়েছে বহির্ম্মুখী। কিন্তু হিস্পানী কাণ্ডই অন্যরকম। স্পেন যুগলনৃত্য যদি গ্রহণ করল ত তাকে 'অলিম্পিক' প্রতিযোগিতায় দাঁড় করাল। এদেশে নাচ এত লালিত্যময়, এত মৃদুমধুর, কিন্তু এতে এরা ক্ষান্ত নয়। মাদ্রিদের বাৎসরিক 'মারাথন' নাচ যেরকম সমারোহে সম্পন্ন হয় তা যেন একরকম জাতীয় উৎসব। এক হাজার ঘণ্টা যে যুগল অবিশ্রান্ত নাচতে পারবে তারা বিপুল পুরস্কার পাবে। রাত্রির পর রাত্রি আলোকে উজ্জ্বল, বাদ্যে মুখর নৃত্যসভায় দর্শক আসবে, কোলাহল হবে, কিন্তু তার মধ্যেও এদের চোখের পর্দ্দায় একাধিক সহস্র আরব্য রজনীর মত এক একটি রাত্রি নূতন মোহ, নূতন আবেশ এনে দিবে। নর্ত্তক-নর্ত্তকীর দল ঘুমে আচ্ছন্নপ্রায় হয়ে আসে, তবু প্রসাধন করে মুখের চূর্ণকামটুকু ঠিক রাখা চাই। এদের মত চূড়ান্ত করতে ইয়োরোপে কেহ পারবে না। সিনরিটাদের দেশে যুদ্ধের প্রয়োজনে যদি পুরুষের ডাক পড়ে তাহলে এদেশের এরা শুধু ইংলণ্ডের মত অফিসে ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জামের কারখানায় পুরুষের স্থান অধিকার করেই নিবৃত্ত হবে না; রাজপুতানীদের মত



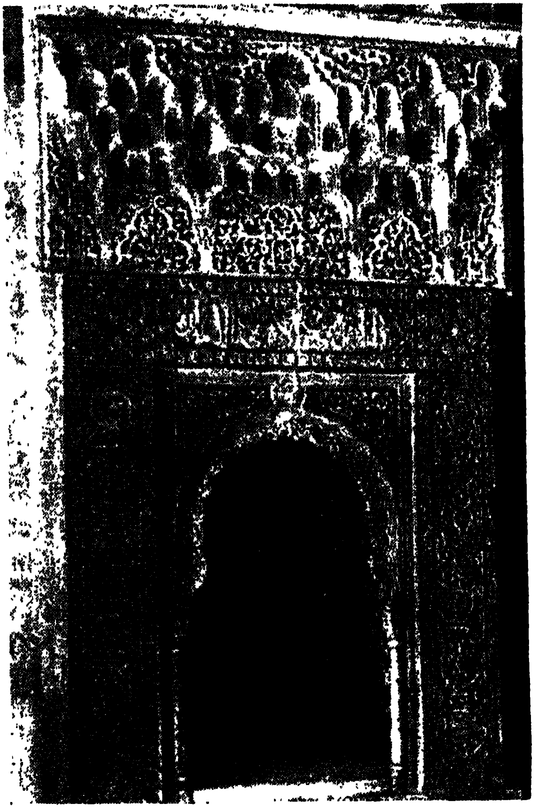
নৃত্যোৎসবের প্রারম্ভে সুবেশা স্পেনীয় তরুণীগণ

ইয়োরোপা



আন্দালুসিয়ার নর্তকী

জহরানলে আত্মাহুতি না দিয়ে রণক্ষেত্রে পুরুষের পার্শ্ববর্ত্তিনী হবে ও পুরুষের স্থান অধিকার করবে। হিস্পানী কোমলাঙ্গী প্রমদারা প্রয়োজন পড়লে সহজেই পুরুষেরও প্রমাদ ঘটাতে পারে।



আল্‌হাম্ব্রার মর্ম্মরস্বপ্ন

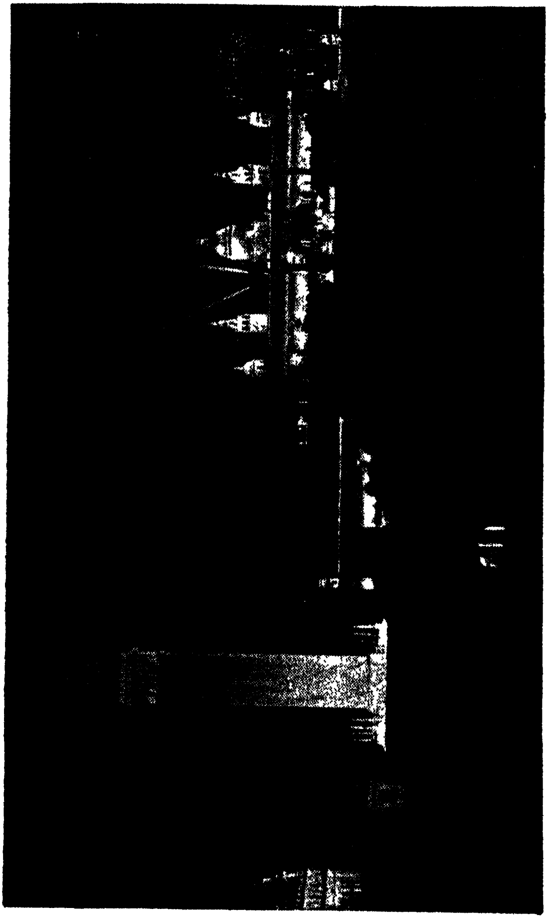
দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে এরা একটি সুকুমার স্বপ্নের সৃষ্টি করে যা চিরকাল ধরে আমাদের কৈশোরের কল্পনা ও যৌবনের অন্বেষণ। প্রত্যহের তুচ্ছতাকে

এরা কি যেন এক মায়াকাঠির স্পর্শে উজ্জ্বল সার্থক করে তুলে, জীবনের উচ্ছল মুক্তস্রোতের মধ্য দিয়ে, ভাবনাহীন কৌতুক প্রমোদে, সুমধুর গীতবাদ্যে, মার্জ্জিত অথচ সহজ রুচির বিকাশে। সাধারণ হোটেলের ভোজনশালাতেও ভোজন শেষে আঙ্গুর-পর্ব্ব চলবে, কক্ষান্তরাল থেকে গীতারের মাদকতাময় মৃদু মূর্চ্ছনা ভেসে আসবে; মূরীয় কারুকার্য্যখচিত দেওয়ালে দা ভিঞ্চির বা তিৎশিয়ানের 'শেষ ভোজন' ছবিটির প্রতিলিপি থাকবে; টেবিলের আবরণটি মূরদের বিশেষত্বসূচক নীলবর্ণের হয়ত হবে; তখন স্নিগ্ধ আলোকের মধ্যে মানসচক্ষে আলহাম্ব্রার মর্ম্মরস্বপ্ন উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, অথবা সারাদিনের দর্শনক্লান্ত চক্ষু আরামে মুদিত থেকেই বিলাসপ্রিয়া সম্রাট্মহিষীদের লীলানিকেতন আলকাথারের শিল্পকলা আবার নিরীক্ষণ করতে থাকে। সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকার ঘনীভূত হবার আগেই উজ্জ্বল নীলাকাশপটে বার্সিলোনার প্রাসাদ বিচিত্র বর্ণের আলোকরশ্মিসম্পাতে মনোহর হয়ে উঠে, প্লেন গাছের ছায়াছন্ন যে পথ রৌদ্রের উত্তাপে মধুর হয়েছিল সে পথ স্নিগ্ধ শান্তিতে ভরে যায়।

স্পেনে এই আমি ঠিক সময়ে এসেছি। শীতের প্রকোপেও এখনো কুঞ্জে কুঞ্জে রৌদ্রে কমলার রং বড় সুন্দর দেখায়—যদিও জানি এই কুঞ্জে বসন্তের চুম্বনপুলক বেশী মানাত। আমি পরিণত পত্রপুষ্পসম্ভারের বিকাশের মধ্যে কোন দেশে যেতে চাই না, কারণ সে সময় যে কোন দেশ সুন্দর হয়ে সাজবে। আমি চাই বসন্তের আভাস, ভবিষ্যতের সম্ভাবনার সূচনা। চাই কুঞ্জপথে এই কমনীয় কমলার নবীন পল্লবশোভা, গুচ্ছে গুচ্ছে অনতিপক্ক ফল, পরিপূর্ণতার রসে আনত নয়, প্রথম ধবলিমার কৈশোর সৌন্দর্য্যে আকুল। এই মাটীতে স্নিগ্ধ স্পর্শ আছে, ভীরু কম্পিত ভায়োলেটের মত অনির্ব্বচনীয় সুকুমারতা আছে, সরস নবীন প্রাণ আছে। আবেশে চোখ বুজে একটি সুন্দরতর জগতের আভাস পাই, যে দেশ পৃথিবীর মানচিত্রে নেই, আছে শুধু কবিতায় ও কল্পনায়।

মাদ্রিয়েরার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই তবু মদির আবেশ অনুভব করি।

ভ্যালেন্সিয়ার নীল সমুদ্রসৈকতের কমলাকুঞ্জের মৃদু সৌরভ আমাকে পাগল



বার্সিলোনার প্রাসাদ—রাত্রির আলোয়

করে তুলেছে। দেহবন্ধন যেন শিথিল মুক্ত হয়ে আসছে। বেঁচে থাকার কী অনির্ব্বচনীয় উল্লাস, কী অপরিসীম আনন্দ!

ছবিতেও যে এত কবিতা ছিল তা কে জানত ?

শুধু একটি প্রাণচঞ্চল কিশোরী একটি পা বরফে রেখে অন্য পাটি বঙ্কিম-ভঙ্গীতে তুলে তুষার-সমুদ্রের মধ্য দিয়ে স্কেটিং করে চলে যাচ্ছে—পিছনে তার চাঁদ উঠেছে, আননে মোহন হাসি, চরণে গতির লীলা, হাতছানিতে সুদূরের আহ্বান। আর

"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।"

নীচে লেখা আছে,—আমার সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ডে এস।

সেই আহ্বান আমার স্বপ্নের সঙ্গে মিশে গেল।

গরমের দেশের লোক আমরা সূর্য্যের মুখ চেয়ে দিন কাটাই। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত থেকে ঘরে আলোর আগমনবার্ত্তা পাই, আর অন্ধকার এমনভাবে অতর্কিতে বিদায় নেয় যেন অনেক বেলায় দেরী করে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙ্গেছিল। ক্রমবিলীয়মান ঊষা বা সন্ধ্যা আমাদের নেই। সূর্য্য যে কখন রঙীন থেকে হলুদে পরিণত হয় তা টেরই পাওয়া যায় না। আবার আমাদের সময়-নিরূপণও হয় সূর্য্যের মুখের দিকে তাকিয়ে হিসাব করে। ভাগ্যে সূর্য্যমামা আছেন, না হলে গ্রামের লোকটি কেমন করে আকাশের দিকে আঙ্গুল তুলে সময় বুঝাবে সূর্য্য কোন্‌খানটায় ছিল তা দেখিয়ে দিয়ে? কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডে এসে প্রভাতের মাধুরী ভিন্নভাবে প্রকাশিত দেখলাম। আর সূর্য্য দেখে সময় ঠিক করে চলার উপায়ও যে নেই তা বুঝলাম। প্রথম প্রত্যূষ থেকে একেবারে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বরফে আলোর যে ঝক্‌মকানি তাতে দিন যে কত হল তা বোঝে কার সাধ্য ?

এদেশের আকাশে নীলিমা ম্লানিমার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। এতটুকু ধূলার আভাস নেই, ধোঁয়া নেই ; অন্তরীক্ষের কোনো অলক্ষ্য ব্যবধান আকাশের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যকে এতটুকুও অন্তরাল করে না। মনের মধ্যেও এমনি মুক্তির

আস্বাদ অনুভব করতে লাগলাম। উষার আহ্বানে সেই উজ্জ্বল নীল আকাশের এক কোণায় একটা পাহাড়ের পিছনে সূর্য্য যখন উঠি-উঠি করে তার অরুণ-রথের আভা অন্যান্য কত পাহাড়ে পরশ লাগায়, আর চূড়ায় চূড়ায় বরফের সাদা লাল আবীর গোলা হয়ে যায়। রং সুরের ঝঙ্কারের মত, তরঙ্গভঙ্গের মত, সৌরভবিস্তারের মত ছড়িয়ে ছড়িয়ে যায়; মনের উপর পড়ে তাকে রাঙিয়ে দিয়ে যায়। সেই সময়টুকুর মধ্যে যখন ঘুম ভাঙ্গে তখন আনন্দ ছড়িয়ে দেবার মত প্রশস্ত জায়গা সুইজারল্যাণ্ডের আকাশ ছাড়া আর কোথাও মেলে না। অসহ আনন্দ বেদনা হয়ে দেখা দেয়।



জেনিভা

সেই মুক্ত আকাশে আমার আত্মা মুক্তি পেয়ে বাঁচল। লঘুপক্ষ পক্ষীর মত যেন তা স্বেচ্ছা-বিচরণ করে বেড়াতে পারবে; শৈলশৃঙ্গের সঙ্গীতের স্রোতে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারবে।

"অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত

প্রভাতের দ্বার হতে সন্ধ্যার পশ্চিম নীড় পানে
দুর্গম দুরূহ পথে কি জানি কী বাণীর সন্ধানে।"

সে বাণীর অনাহত ধ্বনি মনে এখনি যেন ঝঙ্কৃত হয়ে উঠবে, আর সহ্য না করতে পেরে যেন শতধা হয়ে যাবে আমার মন।

শুধু আমার কেন, মানবাত্মার মুক্তি হবে এই আকাশের তলায়। ইতিহাসের পাতায়ও তার প্রমাণ পাই। শিল্পী, বাগ্মী, সংস্কারক, দেশপ্রেমিক পালিয়ে এসে এদেশের বুকে আশ্রয় পেয়েছেন আবহমান কাল থেকে। সুইজারল্যাণ্ড না থাকলে ক্যালভিনের সমরপরায়ণ প্রটেষ্টাণ্টিজমের সৃষ্টি সহজ হত না, গ্রোটিয়াসের আন্তর্জাতিক আইনের মূল সূত্রটির প্রেরণা আসত না; রুশোর সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী যেন এখানেই আদর্শরূপে জেগে উঠেছিল; ম্যাৎসিনির নব্য ইটালীর পরিকল্পনা এখানেই রূপ ধারণ করল। এমন কি, সেদিনকার রুশবিপ্লবের বীজও সুইজারল্যাণ্ডের ভূমিতেই প্রথমে রোপণ করে রক্ষা করতে হয়েছিল। রুশের বিপুল শক্তি ও রাজতন্ত্রকে ব্যর্থ করে লেনিনকে জগতে নূতন মতবাদ ও রাজপাট প্রতিষ্ঠা করতে হত না পর্ব্বত-অরণ্যানীময় স্বাধীনতার লীলাভূমি এদেশ না থাকলে। এদেশ হচ্ছে অত্যাচারীর চক্ষুঃশূল ও অত্যাচারিতের আশ্রয়। চারদিকে চারটি প্রবল বিবদমান রাষ্ট্রকে সংস্পর্শ দিয়েও সংঘর্ষ থেকে অনেকখানি বাঁচিয়ে রেখেছে এই দেশ। এ না থাকলে পৃথিবীর ইতিহাসের অনেক অধ্যায় রাজনীতির অনেক বিবর্ত্তন বাদ থেকে যেত। অথচ এর নিজের শক্তিই বা কতটুকু? তিনটি ভাষা ও তেরটি প্রদেশ (ক্যাণ্টন) একে খণ্ড খণ্ড করে রেখেছে, তবু কত শতাব্দী ধরে এখানে গৃহবিবাদ বা আভ্যন্তরিক যুদ্ধ হলই না।

ইয়োরোপে লিগ অব্ নেশন্স আর একটি হতে পারে, কিন্তু জেনিভা আর একটি হবে না। সব দেশের সব রাজধানীর উপর জেনিভাকে স্থান দিই। এমন বড় কিছু সহর নয়, এমন কিছু সম্পদ্‌শালী নয়; কিন্তু কত বিপ্লবী ও চিন্তাশীলকে বরাভয় দিয়ে পৃথিবীকে বঞ্চিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছে।

এ সহর হচ্ছে 'নন্-কনফর্মিষ্ট'; এখানে আশ্রয় নিতে হলে কোন দল বা রাজনীতির শরণাপন্ন হতে হয়নি কাউকে। রাজরোষ থেকে মাথা বাঁচাতে হলে দুটি সহরের কথা তাদের মনে এসেছে—প্যারিস ও জেনিভা। প্যারিস বিরাট্, স্বরূপ ও আহ্বানময়; জেনিভা সীমাবদ্ধ, সুন্দর ও আত্মসমাহিত। প্যারিস বলতে স্বাধীনতার আশ্রয় তত বুঝাবে না, যত বুঝাবে সুকুমার কলা ও বিলাসলীলা। কিন্তু জেনিভা বলতে প্রধানত বুঝাবে গিরিবেষ্টিত তুষার-শোভিত স্বাধীনতার প্রকাশ। প্যারিসের পিছনে কত ভাবের বিকাশ, কত ঐতিহাসিক 'ট্রাডিশন' যা পৃথিবীকে চমক লাগিয়ে দিয়েছে; কিন্তু জেনিভার পিছনে লেক 'লেমানের' (জেনিভা হ্রদের) ওপারে তুষারশৃঙ্গ মঁব্লাঁ, যা সব সংস্কার ও ইতিহাসের ঊর্দ্ধে মাথা তুলে চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকবে। প্যারিসের দান মানবের হাতে তৈরী; জেনিভার দান প্রকৃতির।

এই স্বাধীনতার দেশটিতে কিন্তু একটী বন্দীর কাহিনী উজ্জ্বল হয়ে আছে। এখানে এসে বায়রণের 'শিলঁ'র বন্দীর দুর্গটী না দেখে কোন লোক চলে যায় না। আর বায়রণের মত বীরকবির উপযুক্ত বর্ণনার বিষয়ই হচ্ছে এদেশ। তিনি ছিলেন বীর, তাই মুক্তিকামী বন্দীর অন্তর যে প্রহরীকে এড়িয়ে মুক্ত আকাশে বিচরণ করত তা সহানুভূতি দিয়ে অনুভব করেছিলেন; আর তিনি যে ছিলেন কবি তা জেনিভা হ্রদে ষ্টীমারে বিহার করে সেই দুর্গে গেলেই বুঝা যাবে। এপাশের নিকটের তীর তীরবেগে যেন ছুটে চলে যায়, আর ওপাশের সুদূরের তীর পর্ব্বতবেষ্টিত হয়ে স্থাণু হয়ে থাকে। ও পারে বরফের চিত্রপট, আর এপারে দ্রাক্ষাকুঞ্জের জন্য সাজান সানুদেশে কখনো কখনো শিল্পী ড্যুরেরের চিত্রের মধ্য থেকে একটী একটী গ্রামের সহসা দৃষ্টিপথে উদয়।

এদেশ যেমন সান্ত্বনা দিয়েছে তেমনি দিয়েছে প্রেরণা। য়্যামিয়েলের 'জারন্যালের' পাতায় পাতায় পাই এদেশের প্রভাব, তীব্র শীতের মনকে জাগিয়ে তোলার কথা; প্রকৃতি যখন নিরাভরণ তখনো তার মধ্যে মনের কত

সম্পদ্ আহরণ। কত মণীষীকে অন্নের চেয়ে অধিক ধন, প্রাণের চেয়ে বড় প্রেরণা দিয়েছে এদেশের সৌন্দর্য্য। হলবীনের চিত্রগুলিতে যে গভীর



একটি গিরিদুর্গ

অনুভব ও জীবনের মুখোমুখী হবার ভাব পাই তাতে মনে হয় যে 'জুরা' পর্ব্বতমালার রং তার সব চিত্র জুড়ে বর্ত্তমান আছে; শিল্পীর মনকে অভিভূত

ও সৃজনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। জুরা ভিন্ন কত শিল্পীকে কল্পনাই করা যায় না।

সৌন্দর্য্য কখনো শ্রান্তি আনে না যদি প্রকৃতি নিজে থাকে প্রাণময়ী আর সে কান্তির মধ্যে থাকে কল্পনা। সুইজারল্যাণ্ডের সৌন্দর্য্য কখনো মানুষের কাছে পুরাতন হয়ে যাবে না। নিবিড় হরিৎ গোচারণ-ভূমির রঙের বর্ণনা ভাষায় দেওয়া যায় না; শুধু একটা ইংরেজী কবিতার পঙ্‌ক্তি বলা চলে।

The emerald green of leaf-enchanted beams—তার উপর বরফে বরফে যখন যুঁই ফুলের বৃষ্টি হয়ে যাবে তখন সে তুষারকণাগুলি লোভী বালকের মত মুখে পূরব, না পাতায় পাতায় হীরা-মুক্তার গুঁড়া ছড়ান দেখে দেখে চোখ জুড়াব ভেবে পাই না। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় মন মূক থাকে না, মুখর ও উত্তরের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠে; এবং রংএর মায়াকাঠির স্পর্শে সবটা দেশ ভাষার আভাসে ভরে যায়।

অগণিত হ্রদে ভরা এই দেশ। প্রত্যেকটীই আবার বর্ণ বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। সূর্য্যের কিরণে চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় প্রত্যেকটীতে আবার স্বতন্ত্র রূপ খোলে। সবচেয়ে সুন্দর দেখায় যখন রাত্রির ঐশ্বর্য্য জলের বুকে প্রতিফলিত হয়। বিশাল পর্ব্বতের ছায়া ও ভাসমান মেঘের মায়া পারের চঞ্চল গাছগুলির পাশাপাশি এমন একটা কম্পমান মাধুরী সৃষ্টি করে যে দিনের বেলাকার বেড়ানর ষ্টীমার যে এর উপর কোন বিক্ষোভ এনেছিল সে কথা মনেই হবে না। আর পারের নিস্তব্ধ 'শালে'গুলিকে ঘুমন্ত মায়াপুরী বলে মনে হবে। কিন্তু আমার কাছে ছোট ছোট হ্রদগুলিই বেশী ভাল লাগে। সেগুলি দেখা দেয় অনেক উঁচুতে দুর্গম স্থানে হঠাৎ দেখার বিস্ময়ে উজ্জ্বল হয়ে; মানুষের রূঢ় চরণক্ষেপ তাদের ধ্যানভঙ্গ করে না; তাদের সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায়, আয়ত্ত করা যায় না।

সুইজারল্যাণ্ডকে এত বেশী ভাল লাগছে পার্ব্বত্যদেশ বলে। এক একটা শৃঙ্গ যেন মানবাত্মার বাণীর প্রকাশ। সমতলের মাটীর মোহ স্বচ্ছ লঘু ও

অগভীর : তার উপর দিয়ে আকর্ষণ ছড়িয়ে যায়, কোথাও এসে ঠেকে না, জমাট বাঁধে না, কিন্তু অসমতলের প্রস্তরের প্রেম চূড়ায় চূড়ায় আকর্ষণের কিরীট পরে ; তরঙ্গভঙ্গের লীলার মত স্বরগ্রামের খেলার মত ঢেউ খেলে যায়। আর সমতল থেকে উচ্চতা মনকে উপরের দিকে টানতে থাকে অবিরাম, রাত্রিদিন। ওই বরফের শৃঙ্গ জেগে আছে চিরকাল, অতন্দ্র, নিদ্রার দ্বারা অনাহত হয়ে, পথিকের জন্য, আমার জন্য।

আজ প্রকৃতির তুষারস্বপ্ন। এদেশের প্রকৃতিকে বলেছি প্রাণময়ী ; এ কথাকে শুধু কথার অর্থ দিয়ে বিচার করলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। মানুষ



Icicle

নিজের হাতে ভৈরবীর মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে, করে নিজে মন্ত্রসিদ্ধ হয়েছে। এই দুরন্ত শীতে গাছপালা সব বরফে ঢাকা, পথ লুপ্ত হয়ে গেছে, বৃষ্টির ধারার মত বরফ ঝরছে, আর সেই দেবতার দান তুষারবিন্দুরূপে সব জায়গায় শোভা পাচ্ছে। সারা বছরে মাত্র কয়েকটি মাস মানুষ প্রকৃতির এই নির্ম্মম দান আশা মিটিয়ে পাবে ; কিন্তু যেটুকু পাবে সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করবে, নিজের প্রাণের রসে রসিয়ে নিয়ে।

ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ডের সীমান্তে একটা উঁচু পাহাড়ে ওঠা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু এরা সেজন্য ক্ষান্ত হয়নি। সেখানে উঠছে বিদ্যুতের তারের সাহায্যে 'টেলিফেরিকে'; এই যাদুঘর যখন নীচের পৃথিবী ছেড়ে ৩০০০ ফিট উপরে উঠতে থাকে তখন জীবনটা একটামাত্র তারের উপর ঝুলে। কিন্তু তা বলে ভয় ত কেহ পায় না। সেই চূড়ায় উঠে এই চিরযৌবন সম্পন্নদের দল নাচবে, গাইবে, আবার খাবে। এরা যদি আমাদের দেশের লোক হত, তাহলে হিমাচলের গোপন সাধকদের চঞ্চল হয়ে পর্ব্বত ছেড়ে অরণ্যবাস করতে হত আর কয়েক বছরের মধ্যে এভারেষ্ট না হোক, অনেক চূড়াতেই পূজার ছুটীটা কাটানর বন্দোবস্ত হয়ে যেত। উপর থেকে নীচে তাকিয়ে দেখলাম যে বরফ সমুদ্রের তরঙ্গগুলি অপরূপ দেখাচ্ছে—

"তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত
পড়েছিল পদপ্রান্তে উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষশত
করি অবনত।"

এই তরঙ্গিত শৃঙ্গরাজি দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখের যবনিকা খুলে যায়; কাণের পর্দ্দা প্রতিধ্বনিতে স্পন্দিত হবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠে। এইখানে ইউরোপীয় সঙ্গীতের মর্ম্মরহস্য যেন উদ্ঘাটিত হয়ে আছে মনে হল; যেন সে সঙ্গীতের ঝঙ্কার সমস্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত হয়ে চূড়ায় চূড়ায় তরঙ্গিত হয়ে পড়েছে বিরাট্ বৈচিত্র্য ও অসীম অনুভব নিয়ে। তার মূল সুরটুকু প্রকাশ পাবে ভারতীয় সঙ্গীতের মত বিজনতার বীণায় নয়, নিখিল বিশ্বব্যাপী অর্কেষ্ট্রার ঝঙ্কারে।

প্রকৃতি এদেশে নিষ্ঠুরা; এখানে 'কোমল-মলয়-সমীরে' অঙ্গ ঢেলে কাব্য চর্চ্চা করা যাবে না, তাই মানুষকে তার সঙ্গে যুদ্ধ করে জীবনের আনন্দ আহরণ করে নিতে হচ্ছে। শীতের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য শীতকেই এরা আক্রমণ করেছে স্কেটিং করে, স্কী-ইং করে, বরফের উপর দৌড়ঝাঁপ নাচ করে। শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কোন পাহাড়ের চূড়ায়

কত বরফ পড়ল, কোন্ হ্রদটা জমে গেল তাই হবে প্রত্যহ প্রভাতের প্রথম খবর। একদিন এমনই একটা সুসংবাদ শুনে লুজান থেকে ছুটে এলাম সাঁ-শার্গে বরফে খেলার জন্য। আর সে কি খেলা? সে হচ্ছে জীবনের উপাসনা। তার মধ্যে কিন্তু মিনতি নেই, আছে পরাক্রম। বন্ধুর স্বতঃপ্রবৃত্ত যে দান তাতে মাধুর্য্য আছে; কিন্তু শত্রুর হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া যে ধন তার সার্থকতার সঙ্গে প্রথমটার তুলনাই হয় না।

কিন্তু এত উল্লাস ও প্রাণের বিকাশের মধ্যেও একটা জিনিষের অভাব চোখে বাজে। এ উদ্দামতার মধ্যে বুদ্ধির দীপ্তি নেই। যে আনন্দ এদের শীতের ভিতর দিয়ে বরফের উপর ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে ভূমার অসীমতা নেই। বসন্তকালকে এরা আহ্বান করল সাগরস্নান দিয়ে, দেশ-ভ্রমণ দিয়ে, শীতকালকে আমন্ত্রণ করল শীতের খেলা দিয়ে। শুধু আনন্দের অন্বেষণই ত এদের মুখে ছাপ রেখেছে; তার বেশী ত কিছু নজরে পড়ছে না। আসল কথা হচ্ছে এই যে, অবিরাম আনন্দলিপ্সা সাধারণ লোকের জীবনে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন এনে দিচ্ছে। এখানে একটী বন্ধুর সঙ্গে কথায় কথায় বুঝলাম যে, সে কোন দিন চিন্তাশীল বলে খ্যাতিলাভ করতে পারত, কিন্তু লঘু আনন্দের দাবী তার জীবনকে অন্য দিকে গতি দিচ্ছে। সে একটী নবীন লেখক। কিন্তু জীবিকা-অর্জ্জনের পর বিশ্রামটুকু সে রাশি রাশি বইয়ের মধ্যে মগ্ন থেকে কাটানর চেয়ে সাগরতরঙ্গে মগ্ন হয়ে কাটান বেশি আকর্ষণীয় মনে করে। সে বলে যে, গভীর রাত্রে সে দিনের বেলায় বিক্ষিপ্ত চিন্তাসূত্রকে গ্রথিত করে আনতে পারে বটে; কিন্তু যৌবনের আহ্বান তার কাছে প্রবল হয়ে উঠে সব কিছুকে মূল্যহীন করে দিচ্ছে। জীবন্ত মানুষ সে জীবনকে উপভোগ করতে চায়; সিদ্ধির জন্য যে সাধনার প্রয়োজন তার ত্যাগ সে স্বীকার করতে চায় না। সে ত্যাগ পরে হবে; যে কোন সময় হতে পারে; কিন্তু যৌবন-সরসীনীরে অবগাহন মাত্র "আজি যে রজনী যায়" সেটুকুর জন্যই সে। খ্যাতির জন্য ক্ষতিস্বীকার সে করে কেন? একটী প্রাচীন

ইংরেজ গ্রাম্য কবির কবিতা উদ্ধৃত করে হেসে বলল "What had my youth with ambition to do?" অস্বীকার করতে পারি না যে, তার কথাও কম সত্য নয়। আজ যে নেশা চোখে রঙীন হয়ে ফুটে উঠেছে, মাত্র কয় বছর পরে তা ধূসর হয়ে যাবে বলে যদি কেহ আজকের মুহূর্ত্তটীকে নিঃশেষে উপভোগ করতে চায় তাকে খুব দোষ দেওয়া যায় না। আজকের দিনের আনন্দ কি কালকের অনাগত সাফল্যের চেয়ে কম মূল্যবান্?



প্রকৃতির তুষার-স্বপ্ন

কিন্তু নীরব খ্যাতিহীন মিল্টন্—যে ফুটিলেও ফুটিতে পারিত—তার জন্য দুঃখ করে লাভ কি? চিন্তাশীলতা সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি হতে পারে না—সাম্যবাদী ফ্রান্স এমন কি সমাজবাদী রুষিয়াতেও নয়।

অবশ্য ইয়োরোপে এমন লোক যথেষ্ট আছেন যাঁরা ক্ষণিকের বিরামের জন্য তাঁদের চিন্তার আশ্রম থেকে উন্মুক্ত প্রান্তরে বা নৃত্যশালায় চলে আসেন এবং

তারপর আবার এই জগৎকে পিছনে ফেলে রেখে যান। ঠিক এই রকম সামঞ্জস্য আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যে পাই না। ইয়োরোপীয়ের চোখের সামনে typical অর্থাৎ বিশেষত্বমূলক ভারতীয় বলতে ফকির বা মহারাজ চিত্র ফুটে উঠে। ভারতবর্ষের কৌপীন ও মুকুট সম্বন্ধেই তাদের যা কিছু ধারণার যখন তখন পরিচয় পাওয়া যায়। সে কথা অস্বীকারই বা করা যায় কি করে? ছেলেবেলায় গল্প শুনলাম, বিলাসী জমিদার লালাবাবু উদাস-করা সন্ধ্যায় একটী বালিকার অনির্দ্দিষ্ট আহ্বানে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। অপরিণত মনের মধ্যে বিশেষরূপে বিভিন্ন ও সম্পূর্ণ সুদূর দুটী চরিত্রে ছাপ পড়ে গেল। ইতিহাসেও রাজা ও রাজ্যের উত্থান-পতন এবং বৈরাগ্যময় ধর্ম্মগুলির অভ্যুদয় ও বিলয়ের কথাই সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বলে পড়লাম। জাহাজের পানশালার কাণ্ড দেখে দেশের দিকে তাকিয়ে মনে হল যে, আমরা মদ খাই না, কিন্তু আমাদের মধ্যে যারা খায় তারা সাধারণতঃ তাল সামলাতে পারে না। আমরা প্রাণের প্রাচুর্য্যে স্বচ্ছন্দ আনন্দ


'টেলিফেরিক'

করতে অভ্যস্ত হই না, সে জন্য ভেসে যাওয়ার ভয় বেশী। জাহাজে বারবার মনে হয়েছিল যে আমরা ভোগ ও ত্যাগ এদুটীর মধ্যে কোন অবিরোধী অবস্থা সহজে কল্পনা করতে চাই না। নিজের কথাও ভাবতে হয়েছিল—ভারতবর্ষের ইয়োরোপীয় জীবনে অনভ্যস্ত ছাত্র ঐশ্বর্য্যময় ইয়োরোপের স্বাধীনতার কোন্ পথে চলে যাবে? সমুদ্রযাত্রায় তরঙ্গের তাণ্ডবলীলা দেখবার জন্যই যে ঘোরাপথে বিস্কে দিয়ে ইংলণ্ডে যাবার সংকল্প করল তার খেয়ালী দুঃসাহসী মন কতখানি সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারবে?

ইয়োরোপের সামঞ্জস্যময় জীবনের একটী উদাহরণ এই শীতের খেলার মধ্যে পেলাম। আমার পরিচিত এক প্রবীণ মণীষী এখানে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে এই তুষার-সমুদ্রে কোন যুবকেরই প্রভেদ নেই। তিনি কখনও আমাদের দেশের সর্ব্বদা গাম্ভীর্য্যে লুপ্তপ্রায় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের মত থাকেন না কিন্তু তাঁর জ্ঞানের দীপ্তি তাঁকে সর্ব্বদাই আমাদের কাছ থেকে পৃথক্ করে রাখত। আমরা বেশ জানতাম এবং সসম্মানে স্বীকার করতাম যে, তিনি আমাদের বয়স্য নন, বন্ধু। এইখানে তাঁর উল্লাস দেখে কোন্ ভারতীয়ের মনে হবে যে, তিনি একজন প্রবীণ জ্ঞানের সাধক? ইয়োরোপের আলোকে আমাদের ধাতকে চূড়ান্তবাদী অর্থাৎ extremist বলে প্রকাশিত হতে দেখলাম।

নব জার্মানী

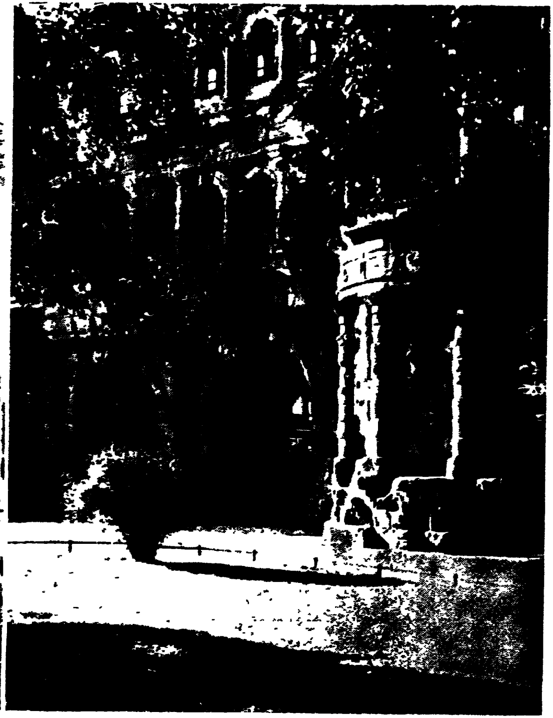
পৌরাণিক ফিনিক্স পাখীর মত জার্মানী গত মহাসমরের চিতাভস্ম থেকে পুনর্জীবন লাভ করেছে।

এ-কথা জার্মানীতে মাত্র এক দিনের জন্য এলেও না মনে হয়ে যাবে না। দিকে দিকে নানা ভাবে নব-জীবনের উৎসাহ ও উল্লাস। ঠিক গ্রীষ্মকালে উত্তর-মেরুতে তুষার গলে সলিলসমুদ্র-সৃষ্টির মত। শীতের স্তব্ধ মৃত্যু বা নিরুপায় অবসাদের চিহ্নমাত্র নেই। গত মহাযুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি ও লজ্জা জার্ম্মানীর মুখ থেকে মুছে গেছে। জাতীয় জীবনে এসেছে অসীম যৌবন, অতুলনীয় বসন্ত। রাইনল্যাণ্ডে জার্ম্মান সৈন্যের অভিযান, সারের পিতৃভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন, ভার্সাই সন্ধির সর্ত্তগুলি একে একে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার—এই সব আলোচনা প্রত্যেককেই উৎসাহিত ক'রে রাখে। মিউনিক মিউজিয়মে বিশ্রামমগ্ন গ্রীক-দেবতা স্যাটারের একটি মূর্ত্তি আছে। তার সঙ্গে তুলনা করে মিউনিকের অধিবাসীরা বলে, "আমাদের দেশ ঐ রকম করে ঘুমোচ্ছিল এতদিন; তাবলে তার সুদৃঢ় মাংসপেশীবহুল দেহ দুর্ব্বল হয়ে গিয়েছিল মনে ক'রো না।" সেই নিদ্রিত দেবতার জার্ম্মানীতে জাগরণ হয়েছে।

ইউরোপে প্রাণ সর্ব্বদাই গতিশীল। দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে দূর ভবিষ্যতের দিকে, গৌরব থেকে নব গৌরবের অভিমুখে তার চিরযাত্রা। তবু বহু ইউরোপীয় দেশে অতীতের দিকে একটি সতৃষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপ ও সলোভ দুর্ব্বলতার আভাস পাওয়া যায় এবং ভ্রমণকারীরাও সাধারণত জীবন্ত বর্ত্তমানের চেয়ে অতীতের গৌরব বেশী দেখে বেড়ায়। কিন্তু বিদেশী পর্য্যটকের দৃষ্টি পড়ে জার্ম্মানীর পুরাতন ঐশ্বর্য্যের দিকে তত নয়, যতটা নবীন জার্ম্মানীর অপরূপ মহাপ্লাবনের দিকে। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ গৌরবের স্বপ্নের দুঃসহ আনন্দে দেশ বিভোর।

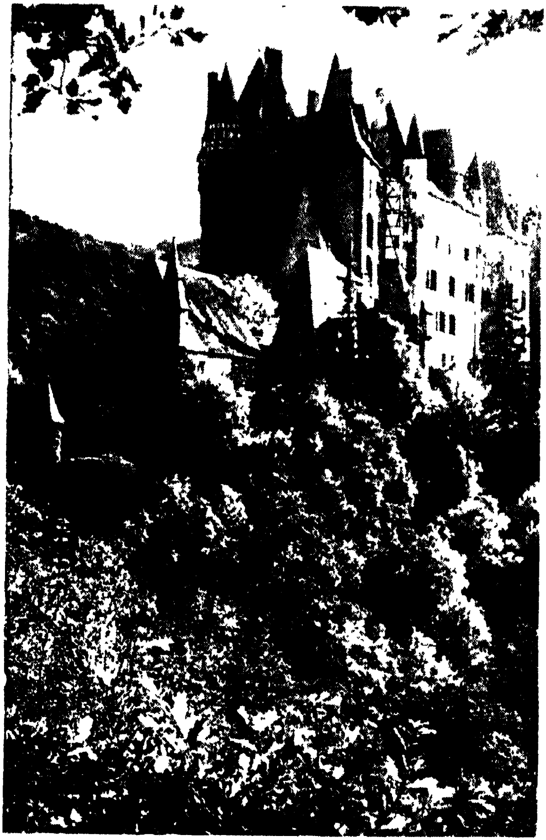


কলোন ক্যাথিড্রাল : পশ্চিম তোরণ



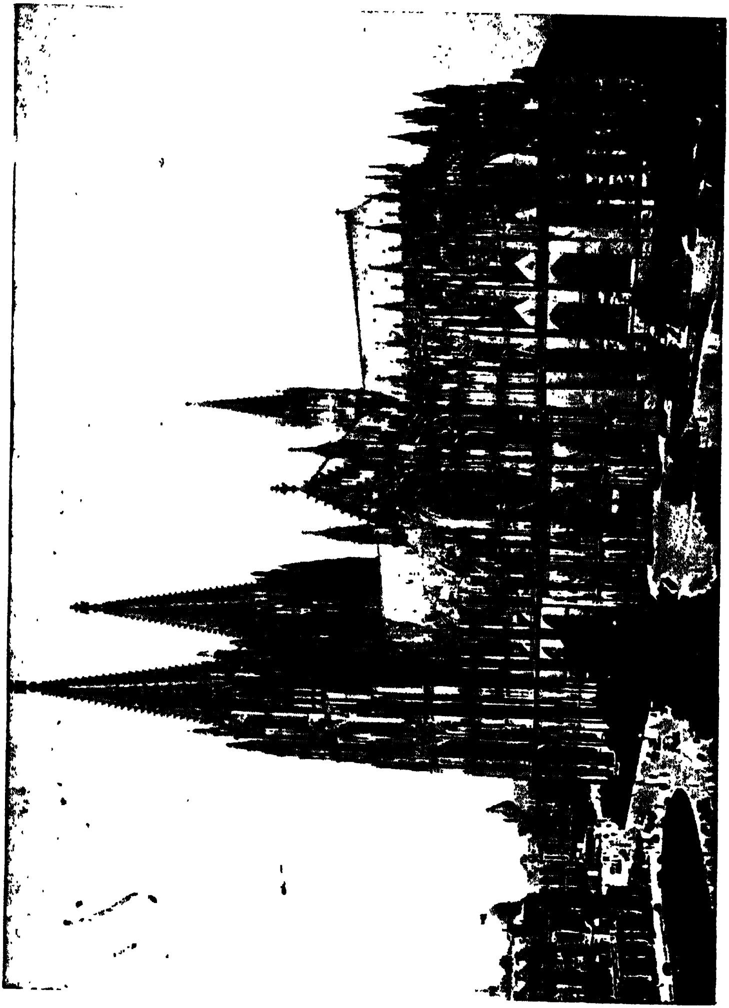
মোসেল নদীর তীরে প্রাচীন নগরদ্বার

ইয়োরোপা



মোসেল নদীর তীরে দুর্গ

ইয়োরোপা



কলোন ক্যাথিড্রাল



আকেনের সৌধচূড়া

কলোনের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গীর্জ্জাটি জার্ম্মানীর অন্যতম গৌরব। কিন্তু কলোনে এসে দেখলাম যে, তার চেয়ে বড় গৌরবস্থল হয়েছে এখানকার ব্রাউন-শার্টের দল। সেদিন একজন নাৎসী নায়ক আসছেন বালক-বাহিনীর কুচকাওয়াজ পর্য্যবেক্ষণ করতে। সেজন্য লোকের কি বিস্ময়কর চঞ্চলতা ও উত্তেজনা! পথের দুই পাশে গৃহে গৃহে জয়পতাকা, নাৎসী অভিবাদনের সমারোহ। অসংখ্য শিখরকণ্টকিত মন্দিরটিতে দেবোপশনার সমারোহ নেই। এমন কি, অভ্যন্তরের শান্তসমাহিত বিশালতার ছায়া বহিরঙ্গনের উদ্দামতার উত্তেজনাকে একটুও স্নিগ্ধ বা সংযত করতে পারছে না। ধর্ম্মের স্থান অধিকার করেছে দেশপ্রেম। নবজাগরণের কোলাহলে মন্ত্রপাঠের গম্ভীর নির্ঘোষ ডুবে গেছে। ক্রুশচিহ্নের স্থান অধিকার করেছে স্বস্তিক-চিহ্ন।

জার্ম্মানীর ইতিহাস হচ্ছে প্রধানত ব্যক্তির ইতিহাস। যুগে যুগে দেশের অধঃপতন ও মোহনিদ্রা হয়েছে এবং তা থেকে উদ্ধার করবার জন্য, দেশকে জাগাবার জন্য কোন অতিমানব পাঞ্চজন্য বাজিয়েছেন; বিপ্লবের বজ্র-নির্ঘোষের মধ্যে দেশের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। এই সব সময়ে এক-একটি আন্দোলন মূর্ত্তি লাভ করেছে। দেশের ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন লুথার, ফ্রেডেরিক, বিসমার্ক, হিটলার। এই রকম সম্পূর্ণভাবে আর কোন দেশে ব্যক্তি-বিশেষরা ভাগ্যবিধাতা হয়ে ওঠেন নি। জার্ম্মান-প্রতিভা গণতন্ত্রের মধ্যে স্ফূর্ত্তিলাভ করে না, করে নেতার মধ্যে। ধর্ম্মের আন্দোলন সৃষ্টি করলেন লুথার; সাম্রাজ্যের কল্পনাকে প্রথম প্রাণ দিলেন ফ্রেডেরিক; জার্ম্মান সাম্রাজ্যকে প্রতিষ্ঠা করলেন বিসমার্ক; আর তৃতীয় রাষ্ট্রের স্রষ্টা হচ্ছেন একমাত্র হিটলার। জাতীয় জীবনের বিকাশ হয়েছে এ-দেশে ব্যষ্টির মধ্যে, সমষ্টির মধ্যে নয়।

জীবনগঙ্গার এই নব-ভগীরথকে বাদ দিয়ে বর্ত্তমান জার্ম্মানী কল্পনা করাই অসম্ভব। ঔদ্ধত্য, অত্যাচার ও রক্তপাতের ভিতর দিয়ে তাঁর বিজয়-অভিযান হয়েছে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ আসনে। কিন্তু এইটাই দেশের মুক্তি স্বরূপ হয়েছে।

বিচ্ছিন্ন, দলবিভক্ত, অপমানিত দেশের অন্য কোন উপায় ছিল না; অন্য কোন পথে তার হৃত সম্মানের এত শীঘ্র পুনরুদ্ধার হতে পারত না। সামান্যভাবেই নাৎসী দলের প্রথম অভিযান হয়েছিল; মিউনিকে এক সময় তাদের চেষ্টা অতি সহজেই দমন করা সম্ভব হয়েছিল। এই সময় যেখানে প্রথম নাৎসী নিহত হয় সেখানে অনির্ব্বাণ অগ্নি রক্ষা করা হয়। জার্ম্মানীর এই একটি নূতন তীর্থ। প্রত্যেক পথচারীকে সেখান দিয়ে অতিক্রম করতে হয় নাৎসী অভিবাদন ক'রে। ইহুদীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচার ও বহিষ্কার; ধর্ম্ম ও সাহিত্যকে পঙ্গু করে দেওয়া; নাৎসীবাদের বিরোধীদের বন্দীশিবিরে অন্তরীণ করে রাখা; বারবার জগতের শান্তি-নাশের আশঙ্কা ঘটান—এই সব হচ্ছে জগৎকে নাৎসী জার্ম্মানীর দান। তবু দেশকে তারা যা দিয়েছে তা স্মরণ ক'রে এই বীর আত্মাগুলির প্রতি সসম্মানে বাহু প্রসারিত হ'ল। জগতে কোন বিপ্লবের পথই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না; ফ্রান্স ও রুশিয়া তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ফরাসী-বিপ্লব দেড় শত বৎসরের ও রুশ-বিপ্লব মাত্র পঁচিশ বৎসরের পুরাতন। সে-সব অত্যাচারের পর আন্তর্জ্জাতিক শান্তি সহানুভূতির কথা বহু আলোচনা হয়েছে; কিন্তু আদিম মানবের প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন হয় নি।

আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জার্ম্মানীর সুদৃঢ়। এই বিশ্বাসের বলেই সে তার প্রাপ্য স্থান ফিরে পাচ্ছে। তার মধ্যে মাঝে মাঝে যে রণহুঙ্কার ও বাগাড়ম্বর প্রকাশ পেয়েছে তা একটুও নিষ্ফল বা নিরর্থক নয়। ব্যায়ামচর্চ্চার রীতি ব্রিটেনে শ্রেষ্ঠ না জার্ম্মানীতে, তা নিয়ে তর্ক উঠেছে এবং যদিও কোন জাতিই নিজের পন্থাকে অপকৃষ্ট বলে স্বীকার করবে না, নিপুণতা ও শৃঙ্খলায় জার্ম্মান-রীতি বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। অলিম্পিক ক্রীড়াতে যেরূপে জার্ম্মানী উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ করছে তাতে ভবিষ্যতে কোন দেশই তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। স্কুলে ব্যায়াম একটি বিষয়; ইউনিভারসিটির শ্রেষ্ঠ শিক্ষার আগে শরীরচর্চ্চায় কুশলতা দাবী করা হয়। ব্যবসায়েও এর প্রয়োজন স্বীকার করা হয়েছে।

দেশের প্রতি কোণটিকে এরা গভীর প্রীতি ও সহানুভূতির চোখে দেখতে শিখেছে। দেশ বলতে কোন ভৌগোলিক মৃত্তিকাখণ্ড মনে করে নি, তার মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে। দেশের প্রত্যেকটি অংশে, বনে উপবনে পর্ব্বতে বেড়িয়ে তার সঙ্গে নিবিড় চাক্ষুষ পরিচয় করছে। শ্রেষ্ঠ "গ্লোব ট্রটারে"র জাতি ভূ-পর্য্যটক থেকে স্বদেশ-পর্য্যটকে পরিণত হয়েছে। মোটর গাড়ীর প্রাচুর্য্যে, দেশব্যাপী রাজপথের প্রসিদ্ধিতে ও এরোপ্লেনের প্রসারে শ্রেষ্ঠ এই দেশের যুবকরা পায়ে হেঁটে দেশ দেখছে। "হবণ্ডারফগেল" আন্দোলন এদেশেই প্রথম সৃষ্টি হয়, পরে ইংলণ্ডে "ইয়ুথ হোষ্টেল মুভমেণ্ট" নামে তার প্রচলন হয়। এই পায়ে-হেঁটে বেড়ানোতে যে নিবিড় আনন্দ পেয়েছি তার সঙ্গে তুলনা কোন মামুলি প্রথায় দেশ-ভ্রমণে পাই নি।

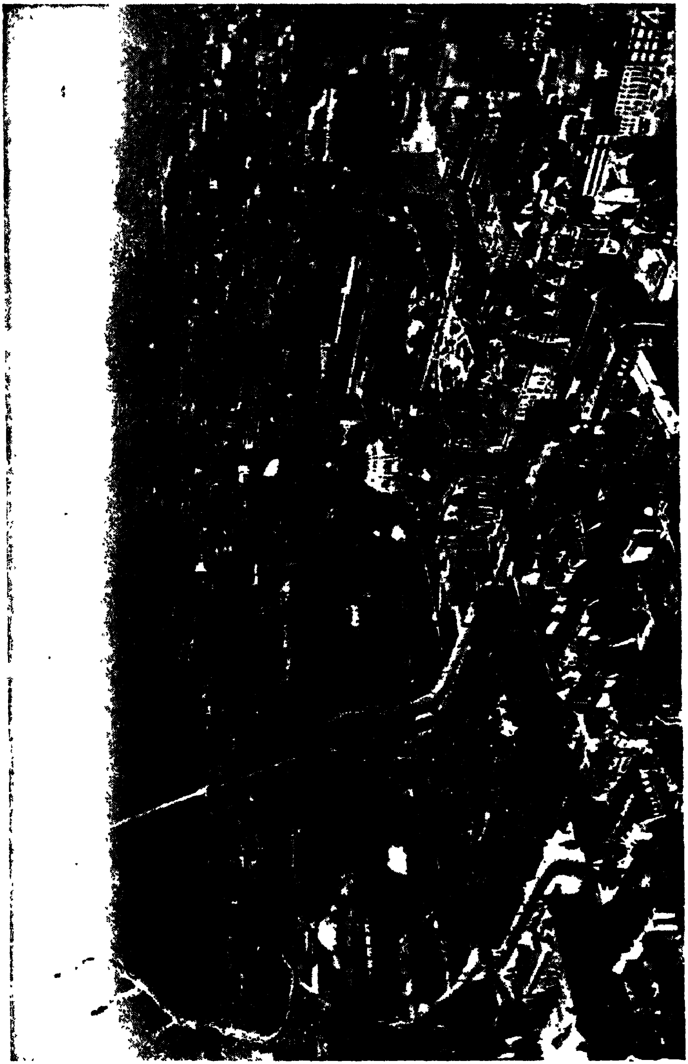
কিন্তু ইংলণ্ড ও জার্মানীর দেশ বেড়ানোতে প্রভেদ আছে। ইংলণ্ডে নিছক মনের আনন্দে হাইল্যাণ্ডসের সাগরপ্রান্তে, হেব্রিডিস দ্বীপপুঞ্জে, লেক-অঞ্চলে ঘুরে বেড়ালাম। প্রকৃতির শ্যামস্পর্শ, তারকাখচিত নীলাকাশের অতন্দ্র নীরবতা, বিজন পর্ব্বতের মৌন মহিমা মনকে সংসার ও রাজনীতির চিন্তা ভুলিয়ে দেয়। ডার্ব্বিশায়ারে প্রস্তরশিখর-কণ্টকিত নির্জ্জনতায় চন্দ্রের পাণ্ডুর কিরণ পড়ে যে চির-রহস্যের সৃষ্টি করে, দূর-দূরান্তরে সন্ধ্যাতারা যে অপলক দৃষ্টিতে আহ্বান করে, তা ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্বের কথা মনে আসে না। কিন্তু জার্ম্মানীতে "শুধু অকারণ পুলকে" আত্মহারা হবার উপায় নেই। নব-বিধান অনুসারে আল্‌প্‌সের শুধু কোন্ অঞ্চলে বেড়ান যাবে তা পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। "হিটলার যুব-আন্দোলনে" যোগ দেবার সময় শপথ করতে হয়—অলসতা, স্বার্থপরতা, ক্ষয়িষ্ণুতা ও পরাজয়-স্বীকারপ্রবণতার বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন যুদ্ধ করতে হবে। তার ফলে রাইন-বক্ষে বা প্রকৃতির যে-কোন নিভৃত অঞ্চলেই যাই না কেন—জার্মান যুবকের কানে বিজনতার বাণী নয়, এই শপথ বিবেকানন্দের অমর বাণীর মত ধ্বনিত হতে থাকে "হে জার্মান ভুলিও না, তুমি জন্ম হইতেই দেশের কাছে বলিপ্রদত্ত।"

"আনন্দের মধ্য দিয়ে শক্তি-সাধনার" সংঘ সৃষ্টি হয়েছে। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমিকদের ছুটি ও বিশ্রামের সময়টা আনন্দে—বলকারক আনন্দে—কাটানোর উপায়ের সন্ধান দেওয়া। শক্তিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। সব কর্ম্ম, চিন্তা, আনন্দ ও উপভোগেরই লক্ষ্য শক্তিসঞ্চয়। বিদেশীরা আতঙ্কে বলে, এই শক্তি-উপাসনা হচ্ছে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নামান্তর। জার্মানরা বলে "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"; আমরা শক্তির পথে মনীষার সাধনা করছি।

দৈহিক স্বাস্থ্য ও শক্তির জন্য বর্ত্তমান জার্মানী দার্শনিক চিন্তাশীলতাকেও ক্ষুণ্ণ করতে পশ্চাৎপদ হয় নি। এদের মতে মনীষার আতিশয্যে দেশে অবসাদ এসেছিল; কাজেই মানসিকতার চর্চ্চার চেয়ে দেহচর্চ্চারই বেশী প্রয়োজন। থাকুক শুধু সেই বিদ্যাচর্চ্চা যার ব্যবহারিক উপকারিতা রাষ্ট্রকে বৈজ্ঞানিক সম্পদে বিভূষিত করবে; দূরে যাক্ ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠ ও ইহুদী-সুলভ আন্তর্জাতিকতার ব্যাখ্যা। নারী ফিরে যাক্ তার নিভৃত নীড়ে; পুরুষের ভিড়ে তার প্রতিযোগিতায় অকল্যাণ হবে। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ও দেশকে সুস্থ সবল সন্তান দানই তার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। বহু বৎসরের কষ্টার্জ্জিত নারী-স্বাধীনতা জার্মানীতে নারী আবার হারাবে। সভ্যতার উন্নতির ঘড়ির কাঁটাটি জার্মানী পিছিয়ে দিতে চায়। বাইবেলের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে; নূতন সংস্করণ বাইবেলের দৈহিক শক্তির প্রশংসামূলক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মিউনিকের ব্রাউন হাউসই জার্মানের বেথহিলেম; আর হিটলারের "আমার সংগ্রাম" বইখানিই নব-বাইবেল।

রাষ্ট্রপতির আদেশ শীতকালে বেকারদের সাহায্যের জন্য প্রতি রবিবারে মাত্র এক "কোর্সে"র খাদ্য খেয়ে বাকী অংশের দাম তুলে রাখতে হবে। সমস্ত জাতি অম্লানবদনে তা পালন করছে। এমনি একটি "হিটলার সন্টাগে" (সন্টাগ—রবিবার) অজ্ঞাতসারে লাঞ্চের প্রথম পর্ব্ব সুপ নিয়ে বসা গেল। তার পরই পুরা দামের এক 'বিল' এসে হাজির। ব্যাপার বুঝে দাবী করলাম যে, সুপের সঙ্গে রুটিও আমার প্রাপ্য। প্রকাণ্ড এক টুকরা রুটি দিয়ে

ইয়োরোপ।



আকাশ হইতে বার্লিনের দৃশ্য



রাইনল্যাণ্ডে গোচারণভূমি

একাধিক লোকের উপযুক্ত সমস্তটা স্থপ খেয়ে হিটলারীয় নিয়মরক্ষা ও সারাদিন অনাহারে রাইন-ভ্রমণের সম্ভাবনাক্লিষ্টের আত্মতৃপ্তি হ'ল। এই অতিভোজনও নিশ্চয়ই ব্রাউন-শার্টদের অনুমোদিত হবে।

কলোনের কোলাহলময় বাদামী বাহিনীর শোভাযাত্রার শান্তি ভঙ্গ থেকে কি বিপুল বিরতি পেলাম কব্‌লেন্‌ৎসের ষ্টীমার-ভ্রমণে। একটি নব-বিবাহিত দম্পতি চলেছে মধুচন্দ্র-যাপনে। ফরাসী স্ত্রী জার্মান স্বামী দুই ভাষা মিলিয়ে কথা বলছে। কেউ অতুলনীয় জার্মান কফি পান করছে। এক পাশে কয়েক জন লোক মৃদুস্বরে গান ধরেছে। জার্মান ভাষা বড় অদ্ভুত। লেখার অক্ষরে বিকট ও ব্যঞ্জনবহুল দেখায়; পুরুষকণ্ঠে তীক্ষ্ণ ও রুক্ষ শোনায়; কিন্তু নারীকণ্ঠে যেন সুধাবর্ষণ করে। দু-ধারে পর্ব্বতশ্রেণী, কোথাও শ্যামল, কোথাও প্রস্তর-বন্ধুর। অশান্ত পবন পর্ব্বতশিখরে খেলা করে; তার হাসির ঢেউ স্বচ্ছ জলরাশিকে চঞ্চল করে যায়। লঘু মেঘ দু-ধারের গিরিদুর্গগুলিকে নিয়ে খেলা করে; অক্টোবরের অনিবিড় কুহেলিকা নদীর তীরে তীরে তরুশিরে অবগুণ্ঠন রচনা করে। মনে হয় সেই রাইন—অগণিত রূপকথা যার তরঙ্গে তরঙ্গে প্রবাহিত, প্রতি প্রস্তর ও গিরিদুর্গের সঙ্গে জড়িত সেই রাইন। 'লোরলেই'-য়ের মায়া-সঙ্গীত শুনতে শুনতে যেখানে নাবিকরা হাসিমুখে প্রাণ দিত, যার মোহিনী মায়ায় রাজপুত্রেরও মন ভুলেছিল, সেখানে এসে মন মুখর ও বক্ষ স্পন্দিত হয়ে উঠল।

রথেনবুর্গের প্রাচীন প্রাচীরবেষ্টিত শহরেও মনে হ'ল বর্ত্তমান জার্মানী থেকে বহু দূরে চলে এসেছি। এদেশে এক শতাব্দী আগেও মাৎস্যন্যায় প্রচলিত ছিল। প্রুশিয়ার রাজা ও অন্যান্য রাজারা প্রতিবেশীর অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে তার রাজত্ব গ্রাস করতে চেষ্টা করতেন। এই শহরেও সেই রকম অত্যাচারের বহু চিহ্ন ছড়ান আছে। প্রস্তর-দুর্গ, পরিখা, অন্ধকার ভূগর্ভের কারাগার, ত্রিপুদস্তম্ভের ঘণ্টা, বীণাবাদিনী রাজকুমারীর বীণাটি—সব মিলিয়ে মধ্যযুগের একটি পরিপূর্ণ চিত্র পেলাম। সৌভাগ্যের বিষয়,

সন্ধ্যার অন্ধকার যখন দুর্গতলের উপত্যকার উপর ছড়িয়ে পড়ছিল তখন কোন যুব-সমিতির কুচকাওয়াজের শব্দ এখানকার সান্ধ্য শান্তি ভঙ্গ করল না।

এমনি আর একটি শান্তির আশ্রয় পাওয়া গেল ফ্রাঙ্কফোর্টে গ্যেটে-ভবনে। ছায়াময় স্নিগ্ধ একটি সঙ্কীর্ণ গলি। আশেপাশে জার্মানীর বিখ্যাত সসেজের দোকান। পুরাতন আবহাওয়া সুন্দরভাবে বজায় রয়েছে। মনে মনে বুঝলাম, সাহিত্যগুরুর গৃহের নিকটে কোন নবীনতার ঔদ্ধত্য শোভা পাবে না।

ব্যাভেরিয়ার একটি পার্ব্বত্যগ্রামে একটি উৎসব-রজনী। বহু দূরের গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে নরনারী এসেছে সেই উৎসবে যোগ দিতে। এই পার্ব্বত্য প্রদেশের বৈচিত্র্যময় পোষাকে সজ্জিতা হাস্যমুখী তরুণীরা পরিচিত ও অপরিচিত সকলেরই বিয়ারের গ্লাসের সঙ্গে নিজেদের গ্লাস স্পর্শ করিয়ে শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করছে। সকলেরই পাত্রে সসেজ ও লাল বাঁধাকপির পাতা সিদ্ধ। এই সরল পার্ব্বত্য লোকদের মধ্যে আনন্দ খুব নিবিড় হয়ে উঠল। ব্যাণ্ড বাজছে, সকলে মিলে সমস্বরে 'কমিউনিটি' পল্লীসঙ্গীত করছে; মাঝে মাঝে উঠে হাত-ধরাধরি করে নাচছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সকলেরই "পরাণ হল অরুণ-বরণী", এমন সময়ে সেই উৎসবের ইন্দ্রজাল ভঙ্গ করে মূর্ত্তিমান্ উপদ্রবের বেশে এক দল ব্রাউন-শার্ট যুবক প্রবেশ করল। তাদের দলের পোষাক এই উৎসবের মধ্যে নিয়ে আসতে একটুও দ্বিধাবোধ করল না। সামরিক 'টপবুটে'র রূঢ় শব্দে একটি মধুর স্বপ্ন যেন নিপীড়িত হয়ে মিলিয়ে গেল। তরুণীরা কিন্তু সাগ্রহে এদের আমন্ত্রণ করলেন। বুঝলাম যে, বাদামী দলই এ-যুগের একাধারে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়—বর্ণশ্রেষ্ঠ ও বরমাল্য-প্রাপ্ত বীর।

উজ্জ্বল তারায় ভরা নীল আকাশের তলায় গ্রাম্য পার্ব্বত্য পথে ফিরে আসতে আসতে মনে হ'ল—কোন্ জার্মানী মানুষের মনে শাশ্বত আসন পাবে। সহস্র রাইন-উপকথার স্মৃতি-বিজড়িত, বিটোফেন-হ্বাগনারের

সুরঝঙ্কৃত, গ্যেটে-শীলারের জার্মানী, না ফ্রেডেরিক, বিসমার্ক ও হিটলারের জার্মানী ?

জীবনের রাজপথের ঠিক উপরেই প্যারিসের 'কাফে'গুলি।

কাফেতে বসে বসেই প্যারিসের সমস্ত জীবনটার একটা বেশ সম্পূর্ণপ্রায় ও সংলগ্ন আভাস পাওয়া যাবে। কবি, শিল্পী, ছাত্র, আমোদপ্রার্থী, বিরাম-সন্ধানী, সাধারণ লোক সবাই এখানে আসবে, পানপাত্রেব উপর দিয়ে খানিকটা সময় কাটিয়ে যাবে। তার মধ্যে কোন আলাপ, আলোচনা, পরিচয়ও হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। অথবা সম্পূর্ণ অপরিচিতভাবে এসে নিজের নির্দোষ প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে চলে যাওয়াও সহজ। পাত্রটী শূন্য হয়ে গেলেই 'বিল' এসে হাজির হবে না অর্থাৎ উঠে যাবার তাগিদ নেই। কর্ম্মক্লান্ত দিবসের সমাপ্তি বা উৎসবচঞ্চল রাত্রির আরম্ভ যদি এখান থেকেই করা যায় তা' 'আ লা মোদ' অর্থাৎ কায়দামাফিক'হবে না এমন ভয় নেই; বরং বিদেশীর কল্পনায় সেটাই আমোদের। 'কাফে' হচ্ছে ফ্রান্সের জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এ না থাকলে ফরাসী জীবনের উৎস এত স্বতঃস্ফুরিত হওয়া বোধ হয় সহজ হত না।

এখানে বসে বসে জীবনের শোভাযাত্রা দেখা যাক। একটী আমেরিকান ধনী এসে বসেছে, তার চোখে এই হচ্ছে পৃথিবীর কামরূপ; একটী জাপানী ছাত্রকে দেখা যাচ্ছে, সে এসেছে গণিতবিদ্যার কাশীতে; একটী পেরুর যুবকের সঙ্গে আলাপ হল, তার কাছে এই হচ্ছে চিত্রবিদ্যার রৌপ্য আকর। এখন বাকী লোকদের চিনিনা; কিন্তু একটী পাগড়ী দেখে ইয়োরোপের 'ফ্ল্যাপার'রা যা মনে করে আজকাল আমারও সে সন্দেহ হচ্ছে—অর্থাৎ, মহারাজা। (ভাগ্যে বাঙ্গালীর শিরোভূষণ নেই!) এ জগতের গৃহদেবতা হিসাবে রাখা উচিত ভিঞ্চির চিত্র--ব্যাকাস।

কি বৈচিত্র্যময় সে শোভাযাত্রা! কত দেশের, কত বয়সের কত উদ্দেশ্যময় নরনারী, বিভিন্ন বেশে, ভূষায়, ভঙ্গীতে আসছে যাচ্ছে। কারো মুখে সবিস্ময়

আগ্রহ, কারো সকরুণ অতৃপ্তি; কেহ বা এসে হাসি বিলিয়ে যাচ্ছে; কেহ



ব্যাকাস—লুভর্

এমন আনন্দক্লান্ত (blase') যে কিছুই লক্ষ্য করছে না। কিন্তু কাফে 'লোরলাই'-এর মত মোহিনী, তার আহ্বানে সাড়া দিতে হবে সবাইকে।

কোন কাফেতে যাও নি? তবে প্যারিসেই সম্ভবত যাও নি। একথার উত্তর নেই।

ইংরেজের ঐতিহাসিক হোমের অভাব লণ্ডনে বড় অনুভব করতে হয় তবু ইংরেজকে ও ইংরেজত্বকে এত বেশী পথে ঘাটে প্রকট দেখি যে 'হোম' যে কোথাও আছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকে না। কিন্তু প্যারিসের বিলাসকেন্দ্রে প্যারিসের আসল অধিবাসীকে আত্মপ্রকাশ করে থাকতে বড় একটা দেখিনা। যাকে দেখা যায় সেই বিদেশী; বুঝি বিদেশীই এখানে অধিবাসী। আর সে কথা অস্বীকারই বা করা যায় কি করে? প্যারিস হচ্ছে বিশ্বের মোহিনী। যত বিলাসী, ধনী, শিল্পী, স্বপ্নদ্রষ্টা প্যারিস সবাইকে অহরহ ডাকছে, আশ্রয়ও দিচ্ছে। যে ক্রোড়পতি অর্থ-উপার্জ্জনের জ্বর থেকে শান্তি পাবার জন্য এখানে এসেছে ও যে রাজনীতিক নেতার মস্তকের উপর মূল্য নির্দ্ধারিত করা আছে তারা দুজনেই সমানভাবে এখানে আশ্রয় পাচ্ছেন। যে রাজা হৃতসিংহাসনের শোক ভুলতে ও যে 'demi monde' তার উপযুক্ত লীলানিকেতন পেতে চায় তাদের উভয়ের প্রশস্ত ক্ষেত্র আছে এখানে। সবাই এখানে আসতে পারে, এমন কি যে গত-যৌবনার শঙ্করাচার্য্য-বর্ণিত অবস্থা হয়ে এসেছে এবং লুভ্‌রের ফ্লানস হালসের চিত্রটীর প্রতিলিপি মুখে বহন করছে সেও এখানে এসেছে। আর এসেছে সাধারণ্‌ বিদেশীরা যারা এই বিচিত্র পারাবত-কুলায়ের বহুবিধ কূজন-আলাপন অন্তত বাহির থেকেও হোক না দীনভাবে শুনে যেতে চায়।

এর অর্থ কিন্তু এ নয় যে, প্যারিসে ফরাসী নেই। যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে বহু অংশ বিশ্বের বিনোদনে ব্যাপৃত। ফরাসীর নিজের শিল্পধারা ও বিদেশীকে পরিতৃপ্ত করবার প্রণালী দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিদেশী হচ্ছে সুখের পায়রা, আসে বিলাস ও তৃপ্তির জন্য; তাকে ফরাসী যা দেয় তা পণ্য হিসাবে, প্রীতির সহিত নয়। সে Folies এ সাজিয়েছে বিপণী, আপনি কিন্তু তাতে মজেনি। নিজের জন্য আছে জাতীয় প্রতিষ্ঠান 'অপেরা'

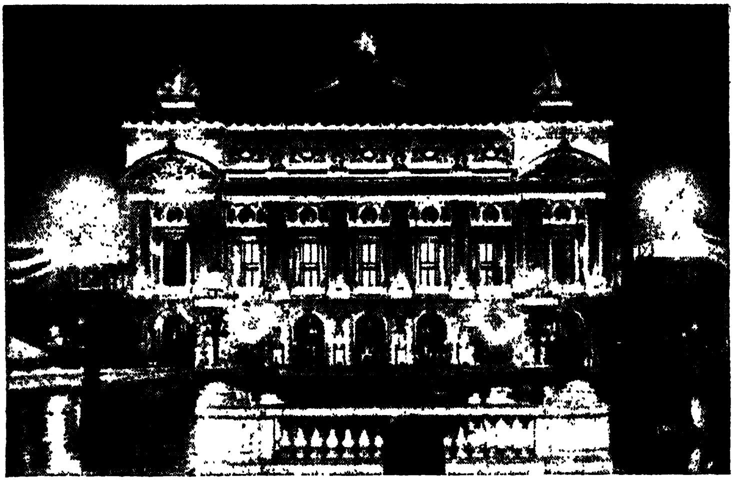
থিয়েটার প্রভৃতি। ইংরেজ ব্যবসাদার হয়েছে রক্তের টানে ; ফরাসী রুচির বৈশিষ্ট্যে।

এটুকুই ফরাসীর বিশেষত্ব। সে নিজে 'শকৃড্' হয় না কিছুতে। তার চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য্য যে শিক্ষা আবহমান কাল থেকে দিয়ে আসছে তা বাহিরের কাছে রোমাঞ্চকর, কিন্তু রুচিসঙ্গত নয়। কিন্তু নিজে ফ্রান্স তার জন্য অসুবিধায় পড়েনি। তার শিল্পরস মাত্র দেহবিশ্লেষ নয়, দেহবিকাশ। যা দেখে ভারতবর্ষীয় সনাতন মানদণ্ড সঙ্কোচে কুঞ্চিত হয়ে যাবে, তার মধ্যে ফরাসী খুঁজবে আনন্দ-সৃষ্টি, কিন্তু একটুও আত্মবঞ্চনা নেই তাতে। শিল্প ও শ্লীলতাকে বিশ্লেষণ করে এমন করেনি যাতে সুন্দরও অশ্লীল হয়। সুন্দরকে সত্য বলে স্বীকার করে শিল্প-কৌশলে হৃদয়াবেগে সুষ্ঠু রচনায় ফরাসী শিব বানিয়েছে। আমরা তাকে দেখি শুধু প্রস্তরবিশেষ। জোলা, ব্যালজাক, পল বুর্জে প্রভৃতির দেশে, কাসিনো ও প্যারি প্রভৃতির দেশে, আশ্চর্যের বিষয় বিদেশীরা খবর নিয়ে দেখে না যে, সম্ভোগ-স্বাধীনতা স্বত্বেও ফরাসী গৃহজীবন শুধু যে সংযত তা নয়, তা সংরক্ষণশীল।

আসল কথা ফরাসী বৈঠকখানা সাজাতে জানে। ইয়োরোপে অল্পবিস্তর সব দেশের সাধারণ লোকেরও কিছু রুচিজ্ঞান থাকে, সৌন্দর্য্যবোধ থাকে। লণ্ডনে ত সন্ধ্যাবেলা গৃহাভিমুখিনী ফুল না নিয়ে গৃহে ফেরে না। কিন্তু সে হচ্ছে তার নিজের ঘরের সজ্জা। ফরাসী সাজাবে বাহির, লোককে ডাকবার জন্য। কোথায় কোন্ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বা রোমান অধিকারের যুগে একটী দুর্গ ছিল ; তার ধ্বংসাবশেষকে ইংলণ্ডের মত ধ্বংসের সাক্ষী করে সাজিয়ে রাখবে না ; তাকে পুনর্নির্ম্মাণ করবে সেই প্রাচীন যুগে যেমন ছিল ঠিক তেমনি করে। তার পাশের প্রাকার ও পরিখা পর্য্যন্ত প্রাচীনতার সৌরভ ছড়াবে, তা না হলে ইতিহাসপ্রিয় ছাড়া অন্য বিদেশী না-ও আসতে পারে। বিলাসীকে আকর্ষণ করবার জন্য ক্ষুদ্র নগরটীতে 'কার্ণেশন' ফুলের মেলা লাগিয়ে দিবে ; ধার্ম্মিকের জন্য কোন সাধুর স্মরণের সপ্তাহ। গিরিদুর্গ-

শোভিত, পুষ্পভূষিত দক্ষিণ ফ্রান্সের একটী সহর কার্কাসণে দেখলাম ঠিক এমনি একটা ব্যাপার। এফেল টাওয়ারকে রাত্রে বিদ্যুতের মালাতে সাজান হয় ঠিক এমনি রুচির প্ররোচনায়। নতুবা মোটর গাড়ীর বিজ্ঞাপন আরো অনেক উপায়ে হতে পারত। প্যারিসের বিশাল সুরম্য রাজপথগুলির সৃষ্টির মূলেও অনেকটা সেই ইচ্ছা।

যাক সে কথা। যে জন্যই তৈরী হোক 'শাজে লিসীর' জন্য জগৎ কৃতার্থ। এই রাজপথটী না থাকলে অনেকের জীবনের শ্রেষ্ঠ, সুখময়, বিলাসবিহারটী অসম্পূর্ণ থেকে যেত। এ ত রাজপথ নয়, এ যে রাজোদ্যান।



অপেরা —রাত্রের দৃশ্য

স্পেনের সহরে সহরে একটী পথ আছে যার সার্থকতা বৈকালিক ভ্রমণে ; এই 'রামব্লা' গুলিতে বিচরণের মধ্যে একটা সম্ভ্রমময় আনন্দঘন সামাজিকতা আছে। প্যারিসের রাজপথ গুলির পিছনে সামাজিকতার বালাই নেই,

আছে স্বাধীন স্বাচ্ছন্দ্য। আর কি এদের প্রসার! চৌরঙ্গী ত তুলনায় সুড়ঙ্গ মাত্র।

কিন্তু এক হিসাবে এই পথগুলিতে ফরাসীকে মানায় না। এদের একটা জাতিগত ধারণা আছে যে, ফ্রান্স হচ্ছে জগতের কেন্দ্রস্থল। মনোরথের এই বিকার রাজপথের প্রসারের সঙ্গে খাপ খায় না। ফরাসী বিদেশের ভাষা বা ইতিবৃত্ত শিখতে বিশেষ উৎসুক হয় না। তার ফলে যে ফরাসী জানেনা তার অন্য কোন ইয়োরোপীয় দেশে গেলে তত অসুবিধা হয় না যত হয় ফ্রান্সে। কন্টিনেণ্টে ধীরে ধীরে ইংরেজীর প্রচার যে ফরাসীকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে তা ফরাসী এখনো বুঝতে পারেনা। ফরাসী নাগরিক বুদ্ধিমান্, কিন্তু সে নিজের বাহিরে বিশেষ কিছু বুঝতে ব্যাকুল নয়। তার জীবনের ভারকেন্দ্র, ধ্যানের বিন্দু হচ্ছে প্যারিস। এমন কি বিদেশী টুরিষ্টে চঞ্চল অথচ বিভিন্ন দেশের বৈশিষ্ট্য-আবহাওয়ায় বিচিত্র প্যারিসও নয়, কেবল প্যারিসের হালফ্যাশন, আদব-কায়দা। তার ফলে সারা ইয়োরোপে বিশেষতঃ নারীরাজ্য যখন হলিউডের ছাপ পড়ছে, হলিউডের হাবভাব, বিলাসভঙ্গী সকলে অনুকরণ করছে তখনো তার লক্ষ্য একমাত্র প্যারিস।

এ অবশ্য ভালই। জগতে ছায়াচিত্রের কল্যাণে পোষাকী জীবনে বিশিষ্টতা অবশিষ্ট থাকছে না। একটা স্থানে তা সুষ্ঠু হয়ে আত্মঘোষণা করুক, পৃথিবী তাতে সমৃদ্ধতরই হবে।

Fetishism যাকে বলে তা ফরাসী মনে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। মনের দিক্ দিয়ে তার ফল বিপুল কিন্তু বৈচিত্র্যহীন। এর দ্বারা একটা রাজতন্ত্র চালান যায়; একটা সেনাসংঘও চলে চমৎকার; কিন্তু গণতন্ত্রের পক্ষে তা পর্য্যাপ্ত নয়, উপযুক্ত ত নয়ই। ফরাসী রাষ্ট্রের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ও ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজন। তা না হলে রাজনীতিক তরণী অনির্দ্দিষ্টকাল কাণ্ডারীবিহনে চলে কি করে? ফ্রান্সের রাষ্ট্রটি আছে শুধু সিভিল সার্ভিসের কল্যাণে। প্রধান মন্ত্রীরা যায় আর আসে; কিন্তু টেনিসনের

ঝরণাটীর মত সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মস্রোত অক্ষুণ্ণভাবে উৎসারিত হয়ে যাচ্ছে। তবু রাষ্ট্রে বা রাষ্ট্রনীতির কর্ণধার নেই। ফ্রান্সে হিটলার না হোক একজন রুজভেল্টও নেই। এদেশে সবদিকেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন। ফ্রান্সে অভাব ব্যক্তির।

কেহ কেহ ইতিহাসের বর্ত্তমান যুগের আরম্ভ গণনা করেন ফরাসী বিদ্রোহ থেকে। এ সম্বন্ধে, বলা বাহুল্য, নানা মুনির নানা মত হতে বাধ্য। সম্ভবত



কার্কাসন

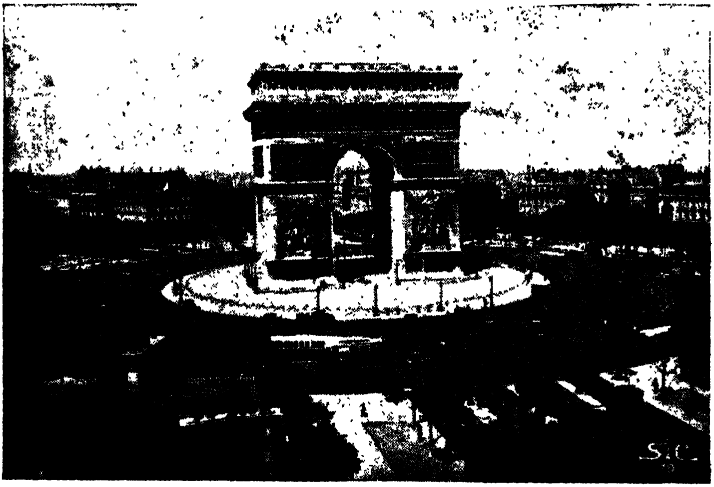
কোন ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক গত রুশবিপ্লব থেকেই বর্ত্তমান কাল গণনা করবেন। তা হলে আমাদের সমবয়সীদের জন্ম হয়েছে মধ্যযুগে এবং মৃত্যু হবে বর্ত্তমানে শুভ আহ্বানের পর। কিন্তু বর্ত্তমান কাল যে চিরকালই এগিয়ে এগিয়ে নূতন নূতন বর্ত্তমানে রূপান্তরিত হবে সে সম্বন্ধে তর্ক না করলেও চিন্তা ও রাজনীতির জগতে ফরাসী বিদ্রোহের দান অসামান্য; সে বিদ্রোহের রঙ্গমঞ্চ ছিল এই প্যারিস। এখনো সাহিত্য ও ইতিহাসের পাতায় পরিচিত পথে পথে ঘুরবার সময় কোন কল্পনাভারাক্রান্ত অন্ধকার রাত্রে 'ত্যুলেরি' বা ব্যাস্তিলের

ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে মানবাত্মার বিপুল নির্ঘোষের প্রতিধ্বনি বুঝি শুনতে পাওয়া যাবে। কী বিরাট্ সে প্লাবন যার স্রোতে পরাক্রান্ত বুর্ব্বনের (Bourbon) সিংহাসন ভেসে গেল ; রূপসী রাণী মারী আঁতোয়ানেঁতের সুচারু কেশরাশি এক রাত্রিতে শ্বেত হয়ে গেল। মানবের জাগরণের রঙ্গমঞ্চ এই প্যারিস। তার সঙ্গে সঙ্গে কত রক্তস্রোত ও যুদ্ধবিগ্রহ গেল এর উপর দিয়ে ; প্যারিসের চোখে কত দিন নিদ্রা নেই ; গৃহদ্বারে শত্রু দুবার হানা দিয়েছে। তবু প্যারিস চিররুচিরা।

অন্তর তার শিল্পরসাপ্লুত। ফ্রান্সকে হারিয়ে বিসমার্ক হরণ করলেন অর্থ ও দেশ ; যার জের গত মহাযুদ্ধেও কাটল না। কিন্তু ইটালীকে পরাজিত করে নেপোলিয়ঁ আনলেন মূল্যহীন শিল্পসম্পদ্ যার জন্য ইটালী নিশ্চয়ই ক্ষমতা থাকলেও আবার যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হত না। দস্যুতা যদি করতে হয় এমন রত্নই হরণ করতে হয় যা গলার হার হয়ে, কণ্ঠের কণ্টক হয়ে নয়, বিরাজ করবে। কর্সিকায় জন্মগ্রহণ করলেও নেপোলিয়ঁর হৃদয় ছিল ফরাসী ; ফরাসীরা তাকে হৃদয়েই রেখেছে। লুভ্র্ তিনি তৈরী করেননি ; কিন্তু একে শিল্পীর স্বপ্নকানন করে গেছেন তিনিই।

লুভ্র্ পরিচয় দিবার চেষ্টা করা বৃথা। কিন্তু ছোটখাট অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত চিত্রশালা বা বিদ্যাপীঠেরও অভাব নেই এখানে। লুক্শেমবার্গে যে বিদেশী যায় না, সে ঠকে বলতে হবে। এমনি আরো কত আছে। ত্রকাদেরোর উপর অনেকের নজর প্রথম পড়ে যখন রাত্রের আলোয় তা বিভূষিত হয়। আমাদের দেশে Sorbonne এর নাম অনেকে জানেন না, অথচ ইয়োরোপের কত মনিষী এখানে শেষ বিদ্যাটুকুর জন্য আসতেন তার ইয়ত্তা নেই। জ্ঞানের আলো যে যুগে ছিল অস্ফুট ও প্রচার ছিল সীমাবদ্ধ, ধর্ম্ম যে যুগে বিদ্যাকে ক্ষুণ্ণ ও আচ্ছন্ন করতে দ্বিধা করত না, তখনো এখানে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ হতে বিদ্যারজন্য জনসমাগম হয়েছে। প্যারীসের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়োরোপের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অন্যতম।

অনেক দূর হলেও ভার্সাইকে প্যারি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। রাজসমারোহ ও বিলাসের দিক্ দিয়ে ভার্সাই ছিল প্যারিসের সম্পূরক। এখানকার বিরাট্ প্রাসাদের চারিদিকে দিগ্বলয় যে শ্যাম অরণ্যানীর সৌন্দর্য্যে আচ্ছন্ন তার মধ্যে যে চতুর্দ্দশ লুইয়ের ফ্রান্সের মূর্ত্তি লুকিয়ে আছে।



রাজপথ-কেন্দ্রে বিজয়তোরণ

এত রূপ ও পাপ, ঐশ্বর্য্য ও ষড়যন্ত্র, বিলাস ও বিফলতা বুঝি ইয়োরোপে আর কোথাও ছিল না। কত সুন্দরীর নৃত্যচটুল চরণাঘাতে এ প্রাসাদের মর্ম্মর এইমাত্র বুঝি মুখরিত হয়ে উঠেছিল; কক্ষ হতে কক্ষান্তরে যেতে বাতাসে কলহাস্যের আভাস এখনি ভেসে আসতে পারে; লালসার অতৃপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস বুঝি এই ক্ষুধার্ত্ত পাষাণে লেলিহান শিখা বিস্তার করে স্পর্শ রেখে গেছে। ক্ষণে ক্ষণে শাহজাহানের দিল্লীর কথা মনে পড়ে। রাজকোষ ও রাজপ্রসাদ ছিল দিবসের শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনীয় সংবাদ। বংশ-সম্ভ্রম বা পরাক্রম তার তুলনায়

নগণ্য ছিল। সমারোহ ও রাজসম্মান ছিল জীবনের ধ্রুবতারা। সমরকুশলতার লোপের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধপ্রিয়তা বৃদ্ধিই পাচ্ছিল। সম্ভ্রান্ত বংশগুলির ভিতরে ঘুণ ধরে জাতীয় জীবন যাচ্ছিল অধঃপাতে। তাই বিলাসে, শিল্পকলাতে, সমারোহের উজ্জ্বলতায় যে গরিমার প্রকাশ ছিল তা অস্তরাগ মাত্র। ভার্সাই তারই দীপ্তি বহন করে দাঁড়িয়ে আছে।



ত্রকাদেরো

রাষ্ট্র বলতে বুঝাত রাজা; এবং চতুর্দ্দশ লুই ছিলেন "বুর্বন" ফ্রান্সের শাহ্‌জাহান।

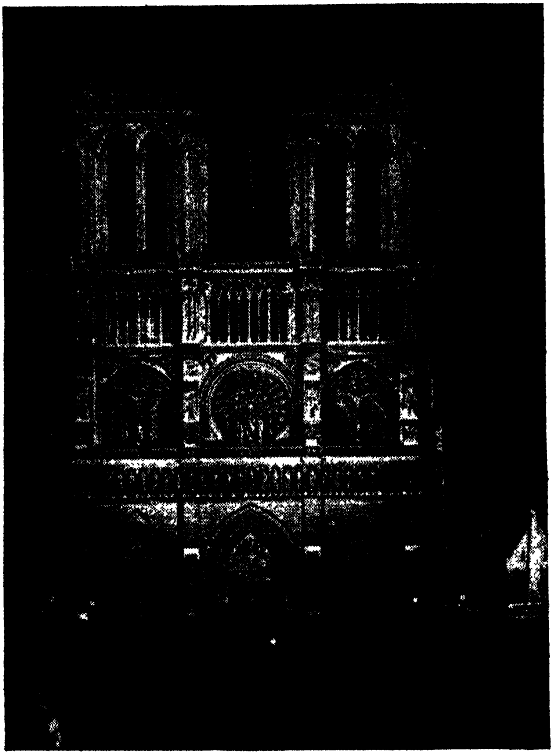
প্যারিকে চিনে রাখা খুব সহজ। ভিক্তর হ্যুগোর পাতায় পাতায় তার সঙ্গে যে পরিচয় হয়েছে তা কি ভোলবার? বা তাকে খুঁজে বের করতে কষ্ট হবে? 'নোত্‌র্ দাম'কে কে না চিনতে পারবে ও-তার ঘণ্টানির্ঘোষ একবার শুনলে দূরান্তরে সে ধ্বনি কার কাণে না প্রতিধ্বনিত হবে সময়ে সময়ে।

সীন নদী সর্পিল গতিতে নগরীকে বেষ্টন ক রে রেখেছে, যে প্রশান্ত উদ্যান ও প্রশস্ত রাজপথ তার সম্পদ, তাদের কোন্ বিদেশী ভুলে যাবে? এমন কি, যার পরিচয় মাত্র এক রাত্রির চিন্তাহীন উৎসবের ভিতর দিয়ে সেও একে চিরদিন স্মরণে রাখবে। চোখে যা দেখা হল তার চেয়ে শতগুণ বেশী অনুভব হল মনে, সহস্রগুণ পরিচয় হল স্বপ্নে। ফরাসী যাকে বলে Flaner সেই লীলা বুঝি প্যারির বাতাসে ভেসে আসে; ক্ষণিকের অতিথিতেও তার চঞ্চলতা সঞ্চারিত করে দিয়ে যায়।

লুভ্র থেকে একবার মোনা লিসার ছবিটি চুরি গিয়েছিল। ফরাসী জাতির এতবড় সর্ব্বনাশ আর কিছুতে হয়নি এমন ধরণের তাতে তোলপাড় হয়েছিল। পরে সেটীকে পাওয়া গেল, কিন্তু ছবির অধরৌষ্ঠ চুম্বনে চুম্বনে বিবর্ণ হয়ে গেছে। চোরের অদ্ভুত মনোবৃত্তির কথা বাদ দিয়েও বুঝতে পারা যাবে এ অত্যাচারটা শিল্পীর চিত্রসার্থকতার প্রতি কতবড় সম্মান। এই গল্প লুভ্রের একজন চিত্রকর যশঃপ্রার্থীর মুখ থেকে শ্রদ্ধার বাণীর মত শুনাল। মনোবিকারের ভিতর দিয়েও চোরের শিল্পরসিকতা লোপ পায়নি। এ চোর নিশ্চয়ই ফরাসী। ফরাসীর অন্তরের বাহিরটা বড় মুক্ত, বড় উচ্ছ্বাসপ্রবণ। সে আন্তরিক বন্ধু হতে পারে না সহজে, কিন্তু বন্ধুত্বের উত্তাপ তার মধ্যে আছে। এই চিত্রকর গিয়োকোন্দার যে প্রতিকৃতি আঁকছিলেন তার জন্য বিদেশীর একটা সামান্য কবিতাও গ্রহণ করলেন।

কখন হাসিয়া গেছ একবিন্দু আনন্দের হাসি
ভুবনে অতুল,
আজিও পড়িছে তাহা কতরূপে কত নবভাবে
কবি শিল্পিকুল,
কখন মুছিয়া যায় আমাদের সুখশান্তিভরা
দুদিনের হাসি,
তোমার হাসিরে ঘিরে আজিও এ তৃপ্তিহীন ধরা
উঠিছে উচ্ছ্বাসি।

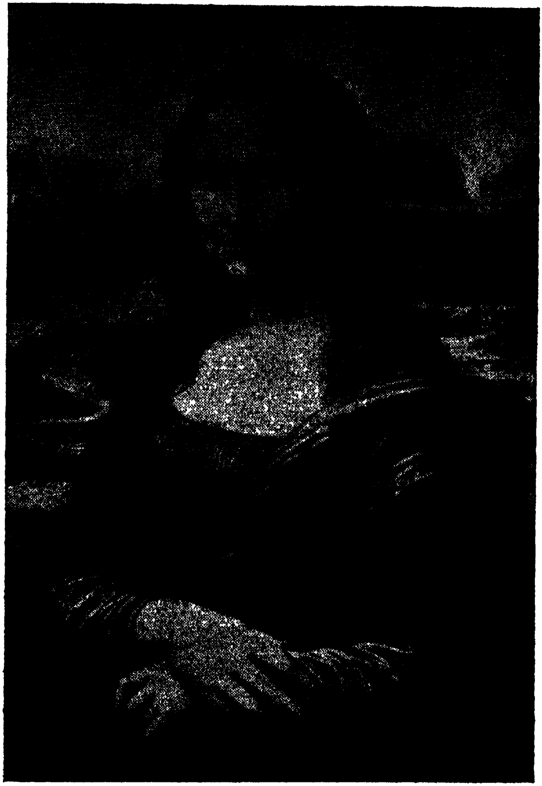
ক্ষীণ চন্দ্রালোক ও কুয়াশায় মাখা রাত্রের প্যারির আকাশ। মৃদু আলোকে একটী রহস্যময় হাসির কথা মনে পড়ছে। সে হাসি একটী চিত্রে আবদ্ধ না থেকে সমস্ত নগরীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। একি আনন্দ, না বিষাদ ?



নোত্‌র্ দাম

এ ত শুধু প্যারি নয়, এ যে বিশ্বের পিয়ারী। "তুমি কারে কর না প্রার্থনা"—স্বর্গের অপ্সরারই মত। তোমার তীর্থে কত বিভিন্ন রসাস্বাদনের জন্য মধুমত্ত ভৃঙ্গসম লোক আসছে আবহমান কাল থেকে—কিন্তু তাদের কারো পরিচয়

বা হিসাব তুমি রাখ না। অনিত্য জীবনের পাত্রে ক্ষণিকের জন্য হলেও নিত্যকাল যে সুন্দরী সুধা ঢেলে চলেছে তার কারো দিকে তাকাবার সময় কোথায়? তাই প্যারিতে শুধু অগণন পথিক আসে আর যায়; কিন্তু প্যারি কারো সন্ধান রাখে না। এ তীর্থে কখনো লোকাভাব হবে না।



মোনো লিসা

"তোমার নয়ন-জ্যোতি প্রেমবেদনায়
কভু না হউক ম্লান"।

এই সময়ে ইংলণ্ডে থাকা উচিত। এপ্রিলের পাদস্পর্শে সারাদেশ জেগে উঠেছে বয়ঃসন্ধিকালের মত। কোন সকালে জেগে উঠে দেখব যে, অলক্ষিতে এল্‌ম্‌ গাছের শাখায় কোথায় ছোট ছোট পাতা দেখা দিয়েছে আর আপেলের কুঞ্জে কোন পাখী প্রথম ডাকতে আরম্ভ করেছে। চারিদিকে সাড়া পড়ে গেছে; মনেও পড়েছে নাড়া। দিনের পর দিন কোথায় নূতন নূতন ফুল ফুটে উঠছে, কতটুকু বর্ণপরিবর্ত্তন হ'ল মাসের মধ্যে, সে সন্ধানে নয়ন আপনি ঘুরতে থাকে। এপিংএর উপবনে বা রিচমণ্ডের উদ্যানে কোন্‌ কোণায় কোকিলের ডাক প্রথম শোনা গেল তার বিবরণ লোকের মুখে মুখে, কাগজের পাতায় পাতায়। প্রকৃতির জাগরণে সংস্কৃত কবিদের যে উল্লাস তারই আভাস পাই এই কর্ম্মব্যস্ত বিষয়ী ইংলণ্ডের জীবনে।

এরা প্রকৃতিকে দেখছে সংস্কৃত কবির আনন্দ দিয়ে, আবেগ দিয়ে নয়। এদের চোখ ও মন পৃথক্‌; ব্যবহারিক জীবন দিয়ে তাকে অনুভব করতে চায়, ধরণীর ধূলিতে তার চরণস্পর্শ খুঁজে; আকাশের স্পর্শহীন প্রাপ্তির অতীত নীলিমায় নয়। মার্চ্চ-এপ্রিলে এরা পদব্রজেই দিগ্বিজয় করতে বের হল, সাঁতার কেটে, নৌকা বেয়ে, মুক্ত প্রান্তরে নেচে, হেসে খেলে প্রকৃতির সম্বর্দ্ধনা করল; সঙ্গে সঙ্গে মাতল মন, জাগল জীবন। ঘরে ঘরে ফুলের শোভা দেখা গেল, আর তার সঙ্গে বহির্মুখী জীবনের লীলা। প্রকৃতি জেগেছে, তাই স্বতন্ত্রভাবে এরাও জাগল কিন্তু তার মধ্যে আত্মবিলোপ করল না। মানুষের মনের প্রতিচ্ছবি, জীবনের উপমা এরা প্রকৃতির মধ্যে খুঁজে বেড়ায় না। এরা প্রিয়ার হস্তে লীলাকমল, অলকে বালকুন্দ, কর্ণে শিরীষ ও মেখলাতে নবনীপের মালা সাজিয়ে দেয় না। ইয়োরোপা বড় জোর হরিণাক্ষী, অথবা মরালকণ্ঠী, অথবা রক্তগোলাপ সদৃশ; কিন্তু তাকে ফুলসজ্জায় সাজিয়ে ফুল-শয্যায় পাঠাবে না ইয়োরোপের কবি।

"শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্‌।

· উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি ॥"

এমন কথাটা তার মনে আসবে না। তার মানসী মুকুরের সামনে মুখে মাখে রাসায়নিক গোলাপভস্ম, শুভ্র লোধ্ররেণু নয়।

আপনার সুখ-দুঃখের সঙ্গে বিজড়িত করে প্রকৃতিকে ইয়োরোপ আপনার মনে করে না। শকুন্তলাবিরহকাতর বনভূমি ইয়োরোপের মাটীতে নেই। ভবভূতির রামের সান্ত্বনাস্থল হবে না এখানকার নিভৃত উপবনগুলি। এগুলি জীবনের উল্লাসের, অনুভবের নয়, বিহারক্ষেত্র। এখানে মানুষ প্রকৃতিকে সাজিয়েছে ও সম্ভোগ করেছে, তার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে আত্মবিলোপ করেনি। তার সঙ্গে পরিচয় করেছে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। তার কাছে আসে সেবকের বিনয় নিয়ে নয়, বিজয়ীর ভোগস্পৃহা নিয়ে।

প্রকৃতি পর্য্যাপ্ত হলেই প্রগতি সাধারণত আড়ষ্ট হয়। যা জয় করে নিতে হয় না, যাকে হারাবার ভয় নেই, তার জন্য কে কবে দ্বিতীয়বার চিন্তা করে? এবং যুদ্ধ করে ছিনিয়ে নিতে না হলে কেই বা আপনাকে সবল করে রাখতে চায়? তাই সুখের দান পেয়ে পেয়ে আমরা ভারতবর্ষে দুর্ব্বল ও অলস হয়ে গেছি। আমাদের উত্তাপের দেশে জন্ম হচ্ছে অগণিত; মানুষ গণনা করি কোটী দিয়ে; মনুষ্যেতরকে ত গণনাই করি না। তাই মানুষের জীবন যেমন ক্ষীণ, মৃত্যুও তেমন সুলভ। বলতে কি, জন্ম ও মৃত্যু যেহেতু বিধাতার ব্যাপার, মানুষ তাতে হস্তক্ষেপই করতে চায় না। লক্ষ লক্ষ জন্ম ও মৃত্যু অলক্ষিত, জীবনও লক্ষ্যহীন। ওপারের চিত্র কিন্তু অন্যরকম। প্রতি কীট-পতঙ্গের জীবনের ধারা ও ইতিহাস লক্ষিত ও লিখিত হচ্ছে; প্রত্যেকটি ফুলের নাম, গন্ধ ও বর্ণ লোকে জানে; রুচি ও সৌন্দর্য্যচর্চ্চার ক্ষেত্রে তাদের স্থান অতি উচ্চে। আমাদের দেশের মত এদের সার্থকতা নির্ভর করে না শুধু কবিপ্রসিদ্ধির উপর। সার্থক জন্ম এদেশের ফুলের।

শুধু ফুল? সমস্তটা জীবনই ত ফুলের মত শোভা ও সুরভিতে বিকশিত

করে তুলতে পারা যায়। চারিদিকে হাসিমুখ, সুস্থ সবল দেহ, উৎসাহিত মন দেখতে পাই। পায়ে অপরূপ গতিভঙ্গিমা, চোখে স্বপ্ন ও মাথায় সোণার ঐশ্বর্য্য নিয়ে কতজনকে যেতে দেখছি। এই পূর্ব্ব উপকূলের তাঁবুর সহরটিতে একজনকেও দেখছি না যাকে মনে মনে কোন ফুলের নামে না ভূষিত করতে পারি। একটী শুভ্র নিষ্কলঙ্ক মুখকে নাম দিলাম 'লিলি হোয়াইট'; একটী লাজুক কিশোরকে 'স্নোড্রপ'; আর আড়ম্বরময় একজনকে 'রোডোডেনড্রন'। শেষোক্তকে 'স্ন্যাপড্র্যাগন' বললেও চলে।

ক্যেন্টরে বসন্তের প্রথম মাদকতাটুকু উপভোগ করতে এসেছি, কারণ এখানে ভারতীয় কেহ আসে বলে জানা নেই। পায়ের ও মনের শৃঙ্খলা খুলে গেছে, তাই হতে চাই মুক্ত, সব দিক্ থেকে, নিজের পরিচয়ের হাত থেকেও। অপরিচিতের সঙ্গে চাই পরিচয়, নিঃসঙ্গের সঙ্গে বিশ্রস্ত আলাপ। আমার বাহিরে আমি আসব নিঃসঙ্কোচে, কারণ কেহ আমার অন্তরের স্বাতন্ত্র্যকে আঘাত করবে না; ও অপরিচয়তাকে অক্ষুণ্ণই রাখবে। ব্যবহারিক সভ্যতার মুখোস খোলার এই প্রশস্ত স্থল পেয়েছি।

সারি সারি ছোট ছোট তাঁবু খাটান আছে, এতখানি দূরে দূরে যেন নির্জ্জনতা না ভঙ্গ হয়। কোথাও বা পরিত্যক্ত ট্রামগাড়ী একখানা রয়েছে রথিবিহীন বিদ্যুৎরথের মত। তাতেও লোক থাকতে পারে। ঘরবাড়ীর বালাই নেই। দরজায় টোকা দিয়ে ঢুকতে হবে না। কবি ও কবি-বন্ধু 'বাহাত্তুরে' ম্যাথু দুজনেই এখানে একবয়সী এবং পরস্পরের কাছে সংকোচহীন। আপাতত আমার তাঁবুতে তিনটী কিশোরের হাসিমুখ দেখা যাচ্ছে,—এদের কাছে এটাই লুকোচুরি খেলার খুব সুবিধাজনক জায়গা মনে হয়েছে। এরা থাকে একটা ট্রামে মায়ের সঙ্গে, দিন কাটায় হৈচৈ ও স্ফূর্ত্তি করে; আমাদের 'হলিডে ক্যাম্পে' এদের কেই বা না চিনে?

এখানে সবরকম ও সবশ্রেণীর লোক এসেছে তাদের নিজ নিজ পরিচয় পিছনে ফেলে, সকলের সঙ্গে সমান হয়ে, নিজের-ইংরেজসুলভ স্বভাবের

কোণীয়তা (angularity) ঘসে মেজে ঠিক করে নিয়ে। আত্মগোপনকারী রোমান্টিক ধনিসন্তান বা ক্যামডেন টাউনের কেরাণী যে কারো সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করতে চাই তা বর্ষার স্রোতোধারার মত স্বতঃ উৎসারিত হবে ; তার কর্ম্মজীবনের মাহাত্ম্য বা লঘুভার পরিচয়ে বাধাপ্রাপ্ত হবে না। কেহ মনে করিয়ে দিবে না যে, সে ব্রাহ্মণবংশাবতংস ও তার সঙ্গে কৌতুক অবাঞ্ছনীয়। এখানে যারা এসেছে তারা সকলেই মুক্ত মন ও স্বচ্ছ স্বভাব নিয়ে এসেছে সাময়িকভাবে। উদার আকাশ ও অসীম সাগরের সঙ্গমস্থলের দৃশ্যের সামনে, কৃত্রিম সভ্যতার আরাম ও আবেষ্টনের বাইরে আনন্দপূর্ণিমায় যারা মিলিত হয়েছে তাদের মধ্যে দাম্ভিকতা ও সংকীর্ণতার কথা আসতেই পারে না। এই হচ্ছে আমাদের স্বভাবের স্থিতিস্থাপকতার পরিচয়।

প্রাতরাশের পর থেকেই দিন যে কি করে কাটাব তার ঠিক পাই না। এতভাবে এত পথে তা কাটান যায়। জনতা ও বিজনতা উভয়েরই বাণী কাণে এসে পৌছায়। কোথাও একটী দল ফুটবল খেলছে, কোথাও অন্যান্য খেলা। বালুবেলায় ছেলেমেয়েরা রঙীন রবারের বল নিয়ে হাতাহাতি করছে ও আছাড় খেয়ে নাকাল হচ্ছে ; স্নানপ্রিয়রা ঢেউয়ের তালে তালে জলে নাচছে। একটী দল বসনহীনতার প্রায় কাছাকাছি এসে (দিগম্বর নয়) নানারকম বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গান করতে করতে সাগর-সম্মেলনে যাচ্ছে। তারা চায় জনতা। কেহ বা একা একা রৌদ্রদাহ উপভোগ করছে ; যে যত দগ্ধবর্ণ হবে সে ততই লণ্ডনে ফিরে গেলে আকর্ষণীয় হবে, সবাই ঈর্ষ্যায় ও প্রশংসায় তার দিকে তাকিয়ে ভাববে যে, সে দস্তুরমত একটা ছুটী উপভোগ করে এসেছে। দলে দলে লোক দূরে দূরে বালুকায় দেহ রক্ষা কোরে রৌদ্রের দান গ্রহণ করছে। এদেশে মাত্র চার-পাঁচ মাস ভাল করে সূর্য্যদেবতা দেখা দেন, তাই তার কিরণধারা সঞ্চয় করে রাখবার এত আগ্রহ। সবাই আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে, ভারতীয়ের দেহে কি প্রচুর পরিমাণেই না সূর্য্যোত্তাপ সংগৃহীত আছে এবং সেইজন্যই বুঝি গরম দেশ থেকে আসা সত্ত্বেও তার প্রথম প্রথম শীত করে কম।

আর যদি ইচ্ছা হয় ওই বিস্তীর্ণ বালুবেলায় একাকী উপলবন্ধুর পথে সাগরজল স্পর্শ করতে করতে বহুদূর চলে যেতে পারব, মনে মনে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' আবৃত্তি করে। হয়ত কারো সঙ্গে দেখা হয়ে বিজনতা ভঙ্গ হবে না; হয়ত কেহ শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে নীরবে চলে যাবে; হয়ত কেহ জিজ্ঞাসা করবে "পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?"

এই একটী প্রশ্নে কত প্রশ্ন ও কত প্রশ্নের অতীত কথার আভাস মনের মধ্যে ভেসে উঠতে পারে। কল্পনার স্রোত বাঁধ ভেঙ্গে ছুটে চলে। কোন্ অজানা জায়গায়, কোন্ হঠাৎ-দেখা সরাইয়ে, কোন্ বিজন গোলাপলতা-বিতানে ছাওয়া গলিপথে তনুগাত্রী সুনীল-নয়না কনককেশিনী কপালকুণ্ডলা নিমেষের তরে দেখা দিয়ে মিলিয়ে যাবে। তখন, তখন হয়ত

"চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে।"

অথবা কখনো হয় ত সাগরের কোলাহল ত্যাগ করে নগরের লোকালয় বেশী ভাল লাগবে। আপেলকুঞ্জ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পরিচিত ইংলণ্ডের দৃশ্য দেখতে পাব ও মন পুলকিত হয়ে উঠবে। কত কবিতায় এর বর্ণনা; কত নিবিড় পরিচয়, কত সুকুমার সৌন্দর্য্য দিয়ে এ দৃশ্যকে সাহিত্যে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রত্যেকটী ভূমিখণ্ডের বর্ণনা দিয়ে তাকে অন্যটী থেকে পৃথক্ করে বেছে নিতে পারব, কারণ এদেশের স্থানবর্ণনায় কবিপ্রসিদ্ধির বালাই নেই। এরা নিজের অন্তর দিয়ে নিজের দেশের স্নিগ্ধ সৌকুমার্য্যটুকু দেখতে পারে; এমনিভাবে একটী লোকালয়কে দেখবার ইচ্ছা হল হয়ত কখনো।

"Sweet William with his homely cottage-smell,
And stocks in fragrant blow;
Roses that down the alleys shine afar
And open jasmine-muffled lattices,

And groups under the dreaming garden trees,
And the full moon, and the white evening star."

Jasmine-muffled lattices-এইটুকুতেই সৌন্দর্য্যময় সুশোভন ইংলণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করে প্রাণময় হয়ে উঠে।

নর্ফোক ব্রড্‌সের নীতি হচ্ছে—"মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে"। জলে স্বচ্ছন্দ স্বেচ্ছাবিহারের শ্রেষ্ঠস্থান হচ্ছে এখানে। পাল তুলে নৌকা (yatch) সপ্‌ সপ্‌ করে শান্ত স্বচ্ছ জলরাশির উপর দিয়ে চলে যাবে; দুধারে ধানের শীষের মত লম্বা লঘু জলঘাস, তার ভিতর দিয়ে সর্‌ সর্‌ করে বাতাস বয়ে নৌকার স্তব্ধ শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। নৌকার পালের ছায়ায় বসে ডেকচেয়ারে একখানি বই নিয়ে অথবা উদার দিগন্তের দিকে আঁখি মেলে বা নিমীলিত রেখে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিই। আহারের উপকরণের জন্য স্থলে যেতে হবে না; কোথাও না কোথাও জলেই নৌকার দোকান ভাসছে; তীরে তরী এনে স্বপ্নভঙ্গ করতে হবে না। কোন তৃণাচ্ছাদনের মধ্যে একটী বক, কোন বাঁকের অন্তরালে প্রাচীন সময়ের চিহ্নস্বরূপ একটী উইণ্ড-মিল দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, কল্পনার পাল দিয়ে তাকে উদ্দামগতিতে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে। যে যত বেশী কর্ম্মক্লান্ত, যত বেশী অর্থের সন্ধান ও সাশ্রয়ে বিজড়িত, রক্তকরবীর রাজার মত যে যত বেশী সুবর্ণশৃঙ্খলিত, সে সাময়িক মুক্তিকামী হলে তার কাছে এই ব্রড্‌স্ তত বেশী বিরামস্থল বলে মনে হবে। নিস্তরঙ্গ নির্ভয় জলরাশি যে শান্তিপ্রলেপ দেয় তার তুলনা সহজে মিলে না। সবচেয়ে ভাল লাগে সুকঠিন নিয়মনিষ্ঠা ও ব্যবহারিক সামাজিকতার অভাব। সেজন্যই যে সব ধনীরা এখানে আসে তাদের বিশিষ্ট মনোবৃত্তিসম্পন্ন বলতে হবে। এখানে যে রকম খরচ পড়ে তাতে তারা সম্ভ্রান্ত বিলাসের স্থলে গেলেও পারতেন।

এখানে এলে পূর্ব্ববঙ্গের জলভরা ধানক্ষেতের কথা মনে হবেই। কিন্তু এই জলরাশির মধ্যে বিজড়িত নেই দরিদ্র কৃষকের আশা ও আশঙ্কা এবং

কুটীরবাসীর সামান্য কুটীরের নিরাপত্তার সমস্যা। আর একটী অভাব আছে যার জন্য এই ব্রড্‌সকে যথেষ্ট পরিমাণে রোমান্টিক মনে করতে পারলাম না। একটী চক্রবাকমিথুন সুকোমল শষ্পরাজি ও স্বচ্ছ জলরাশিকে পরিপূর্ণ একটী রূপ দিতে পারত। সে কথা বিশেষ করে মনে হয় যখন আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারেও নীচে নৌকার ভিতরে নেমে আসার প্রয়োজন থাকে না, সারা-দিনের লক্ষ্যহীন ব্যাঘাতহীন জলবিহারের আনন্দের উপর একটা অকারণ ও পরিচয়হীন অব্যক্ত বিষাদ ছায়াপাত করে। মনে হয় সমস্ত পৃথিবীটুকুকে, সমস্ত আকাশখানিকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করার বিশেষ প্রয়োজন আছে, এই জলের উপরে যে শুভ্র শান্ত সুপ্তপ্রায় জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়বে তাকেও অন্তরে না নিলে সারাটী দিনের উজ্জ্বল আলোকে সম্পূর্ণতা দান করা যাবে না।

সমস্ত দেশটার বসন্তকালটুকুকে স্পর্শ কোরে অনুভব করবার জন্য একটা অব্যক্ত ব্যাকুলতা জেগে উঠছে। বইয়ের পাতা থেকে গাছের পাতার দিকে কতবার মন চলে যাচ্ছে তার ঠিক নাই। লাইব্রেরীর বিজলী আলো থেকে চোখ বারবার বাইরের ঈষৎ সূর্য্যালোকের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। এ সময়ে পরীক্ষার কথা নিয়ে ব্যস্ত হওয়া যেন অপরাধ, যেন অপবিত্রতা। ঘরের ও বাহিরের, কর্ত্তব্যের ও প্রকৃতির দোটানায় পড়ে অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠে। এ অবস্থায় একমাত্র উপায় হচ্ছে সন্ধিস্থাপন করা। আমিও তাই করলাম। সপ্তাহে সাড়ে পাঁচদিন কাজ ও দেড়দিন অকাজ। দেশে থাকাতে এতটা অকাজের কথা কল্পনা করতেও ভয় করত ও বহু হিতৈষীর হিতবচন ও বাক্যবর্ষণের ভয় থাকত। এখানে কেউ নেই; স্বেচ্ছাবিহারের সুবিধা সুলভ, পথও প্রচুর। কাজেই শনিবার হলেই ছুটী ও বেরিয়ে পড়া। তার ফলে পড়াও ভাল হতে লাগল। পুরস্কার পিছনেই আসছে হয়ত একথা মনে ভেবে পরিশ্রমেও মাধুর্য্য পাওয়া যায়। আর ছুটীর পরে কাজে যে মনোযোগ ও উৎসাহ দেখা দিতে লাগল তা দেশে কখনো অনুভব করিনি। দেহেও ক্লান্তি রইল না, মনে রইল না অশান্তি।

কোন কোন দিন বেরিয়ে যেতাম অশ্বপৃষ্ঠে। লণ্ডনের বাইরে বহুদূর ট্রেণে গিয়ে একজায়গায় নেমে পড়া যেত। বনে বনে অশ্বারোহণের আনন্দ হত অপরিসীম; প্রত্যেকটী মুহূর্ত্ত যেন নবযৌবন এনে দিত সর্ব্বদা। কখনো পথে অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ; কখনো সারাদিন আমার বন্ধু একমাত্র এই চতুষ্পদ। বনের বিজনতা নগরের জনতার পরে বড় মধুর ঠেকতে লাগল। কখন কয়েকজনে মিলে মটরে যাওয়া যেত। এমনি একটা অভিযান হল উত্তর ওয়েলসের পার্ব্বত্য অঞ্চলে। কোন কোন জায়গায় শিলং-পথের মত সংকীর্ণ চড়াই ও উৎরাই; কিন্তু সে পথের শ্যামসৌন্দর্য্য এখানে ছিল না। এখানে ছিল প্রস্তরপথ আর রসহীন প্রস্তরের ফাঁকে ফাঁকে অগণন ফুলের সৌন্দর্য্য। পার্ব্বত্য স্কটল্যাণ্ড ও পার্ব্বত্য ওয়েলসের রং বিভিন্ন। প্রথমটী শ্যামল ও অযত্নবর্দ্ধিত, দ্বিতীয়টী ধূসর ও সুসজ্জিত। ওয়েল্‌স্ বেশী সভ্য ও কথা বলে কম।

সাধারণভাবে ভ্রমও কম হতে লাগল না। প্রায় সপ্তাহেই পদব্রজে কোথাও না কোথাও যেতে পারতাম। অবশ্য সহরতলীর পর বেশ কয়েক মাইল ট্রেণ পার হয়ে যেতে হত, কারণ ইংলণ্ডে নগর গ্রামকে ক্রমশঃ গ্রাস করছে ও ভবিষ্যতে গ্রাম বলতে সহরের সাধারণ সংস্করণ মাত্র বুঝাবে। কত ছোট ছোট অজ্ঞাতপূর্ব্ব গ্রামকে নিজের আবিষ্কারের আনন্দে নূতন সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত দেখলাম। কত সামান্য হ্রদ, সাধারণ উপবন ও প্রাচীন গির্জ্জাকে ওয়ার্ডস্বার্থের অনুকরণে দেখতে চেষ্টা ও ইচ্ছা করলাম। "The joy of widest commonalty spread"—এর আনন্দ কতদিন কত তুচ্ছ জিনিষে অনুভব করলাম যা আর একসময়ে হয় ত হাস্যজনক মনে হবে।

মাঝে মাঝে অপ্রিয় প্রসঙ্গও উঠে পড়ত। একদিন একজন সঙ্গী মিস মেয়োর বইয়ের উল্লেখ করলে ও সে নিয়ে বহু আলোচনা হয়ে গেল। তখন একথাও মনে পড়ল আমাদের দেশের কত অভিভাবক এদেশের 'মায়া-রাক্ষসী'র প্রভাবের জন্য সতত শঙ্কিত থাকেন। আমাদের কোন কোন

লোক যদি ওদের সম্বন্ধে বিশিষ্ট অন্যায় ধারণা পোষণ করতে পারে, ওরাও তেমন ভুল ও অন্যায় করতে পারে। প্রবাসী ছাত্রদের মধ্যে যারা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠে তাদের শুধু দোষ দিলেই হবে না, যে সামাজিক অবরোধ ও অন্ধকার থেকে হঠাৎ স্বাধীনতা ও তীব্র আলোকের মধ্যে তারা এসে পড়ে তাকেও দোষী করতে হবে। এদেশ ত আর 'মায়ারাক্ষসী'তে পরিপূর্ণ নয়। কজনই বা এই কালো বিদেশীদের গিলে খাবার জন্য রসনায় ধার দিতে চাইবে? আমরা দেশে থেকে যে সব গল্প শুনে থাকি সেগুলি ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়। আর আমাদের মধ্যেই কি খারাপ আছে কম? বরং সেগুলি আরো বেশী নগ্ন, অসহায় ও অশোভনভাবে চোখের সামনে বিরাজ করছে। কতবার একথা মনে হয়েছে যে, যেখানে ধর্ম্ম দয়াহীন, সমাজ ক্ষমাহীন ও মানুষ মানুষের প্রতি উদাসীন, বৈরাগ্য যেখানে আলস্যের আবরণ ও ক্ষমা দুর্ব্বলতার আভরণ, সেখানে ইংলণ্ডের এত বেশী নিন্দালোচনা ঠিক শোভন নয়। বরং তার গুণাবলির দিকে বেশী মনোযোগ দিলে কিছু উপকার হতে পারে। সবচেয়ে বেশী একথা মনে রাখা উচিত যে, যারা এত উন্নতি করেছে, যাদের এত পৃথিবীবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য—এমন কি, আমাদের সনাতনধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্যের দেশের উপরেও—যাদের এত ঐশ্বর্য্য ও প্রসার, এত সাহিত্য ও সুকুমার কলা, সে জাতির এই উন্নতি অসচ্চরিত্রতার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। দোষদর্শী হওয়ার চেয়ে গুণগ্রাহী হওয়ায় লাভ আছে।

আবার কটি দিন একটানা ছুটী কাটাতে বের হওয়া গেল। ভারতবর্ষীয় গ্রামোন্নতির জন্য একটী সমিতি আছে ইংলণ্ডে। তারই বার্ষিক অধিবেশন হবে। অবশ্য আমার উদ্দেশ্য গ্রামসভা নয়, গ্রাম্যশোভা। অতি সুন্দর একটী প্রাসাদে আনন্দের সঙ্গে সহরের আরাম পাওয়া গেল। সৌন্দর্য্যপ্রিয়ের জাতি এরা, তাই সভার অধিবেশন হবে এমন সুন্দর গৃহে ও সুন্দর আবেষ্টনের মধ্যে। সকালবেলা থ্রাসের কূজন আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে যায়, আর কতদূরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়ি। সবুজ প্রান্তরের মধ্যে হঠাৎ একটী

স্রোতস্বিনী মিলবে; কোথাও বৃহদাকার গরু চরছে; কোথাও একটী চাষা যাচ্ছে; একজায়গায় কাটা গাছের গুঁড়ির উপর একটী শিশু বসান হয়েছে। চারিদিকে একটা সম্পূর্ণতা ও পরিতৃপ্তির আভাস পাই যার অভাব আমাদের দেশে বড় কষ্ট দেয়। কাছেই এক জায়গাতে একটী কৃত্রিম পাহাড় তৈরী করা আছে; তার ভিতর সুরঙ্গপথে ছোট রেলগাড়ী চলছে; কিছু পয়সা দিয়ে তাতে চড়া যাবে। সারাদিন নানা বিষয়ে ব্যস্ত থাকা সহজ; সমিতির কথা বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে না, কারণ মন রয়েছে গৃহাভ্যন্তরে নয়, মুক্ত প্রান্তরে। একটু আগে এক জায়গায় গ্রাম্যসঙ্গীত শুনে এসেছি; গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দলবেধে community singing করেছে; সহজ ভাব, সরল সুর সে সব গানের। তাদের সম্মান গ্রামে ও প্রকৃতির চোখে; নগরের সুশিক্ষিত গীতিনিপুণ সুরশিল্পীর কাছে তাদের বিশেষ দাম নেই। কিন্তু সন্ধ্যার দীর্ঘায়মান ছায়ার মধ্যে এই গানগুলি আমার মনকে আকর্ষণ করেছে; ওয়ার্ডস্বার্থের হাইল্যাণ্ডবাসিনী একাকিনী কৃষকবালিকার গানের মত আমার মনকে কোন্ সুদূরের আহ্বান শুনিয়েছে।

সেখানে তারা ভারতবর্ষীয় গান শুনতে চেয়েছিল; কিন্তু আমাদের পল্লীসঙ্গীত লোপ পাচ্ছে ও সহরে সামান্য কয়জন গীতকুশল ও বাকী সকলে গীতহীন হয়। কাজেই ভারতীয় কণ্ঠ তাদের কোন আনন্দ দিবার আয়োজন করতে পারল না। আমাদের যে নিরানন্দের দেশ।

এমনি করে হার্ফোর্ডশায়ারের সেই গ্রামটীতে আনন্দের মধ্যে এক একটী দিন সম্পূর্ণ শতদলের মত বিকশিত হতে লাগল। ফুলে ফুলে মাটী আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। 'ড্যাফোডিলের' স্নিগ্ধতায় অন্তর স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। 'হেজের' লতাগুল্মের পাশ দিয়ে হাঁটতে গেলেই পাখী পিছন থেকে ডাকে, ঝোপের স্পর্শ যেন আটকিয়ে রাখতে চায়। গর্সের সুবাসে রাত্রের অনিদ্রা আকুল করে ও নিদ্রা নিবিড় হয়ে উঠে। বার বার বুঝতে পারি—

ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বান রবে শতবার করে

রেণেসাঁসে মানুষ পৃথিবীকে ও নিজেকে আবিষ্কার করল। এর দ্বিতীয় বিষয়ের বিকাশে পাই শিল্প ও কৃষ্টির একটা অপরূপ ও অতুলনীয় আবির্ভাব। মানবের ও পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় উদ্বোধন আর হয়নি। মানবতার গৌরবগাথা এমন করে আর কখনো গাওয়া হয়নি। "দেবতারা অলিম্পাস থেকে নেমে এসে আবার মানুষের মধ্যে বাস করলেন।" এই নবজীবনের ধারা জার্ম্মানীতে আনল ধর্ম্মজাগরণ আর ইটালীতে চারুশিল্পের জাগরণ।

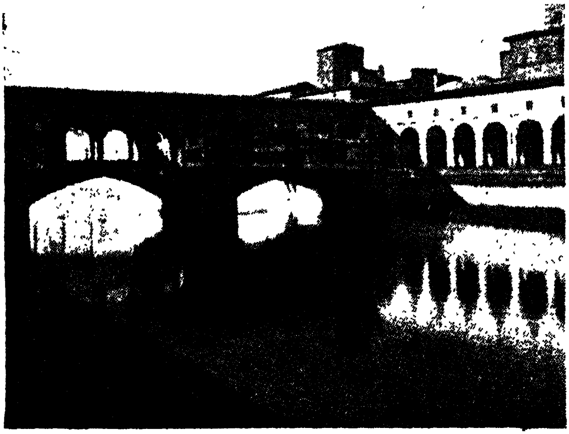
ইতালীর চোখের রঙ বদলে গেল। রিক্ত বঞ্চিত ক্ষুধার্ত্ত তপশ্চর্য্যা থেকে পূর্ণ ভোগময় ঐশ্বর্য্যময় আনন্দরসাপ্লুত প্রাণধারণের প্রণালী। তার সঙ্গে সঙ্গে জীবননদীতে বর্ষার প্লাবনের মত অনেক ক্লেদ ভেসে এল। একটা প্রবাদ আছে যে, Basle-এ একটী গীর্জ্জার তোরণে ক্ষোদাই করা ছিল যে মৃত আত্মারা শেষ বিচারের দিন কবর থেকে উঠে তাড়াতাড়ি পোষাক পরছে; তার একশত বছর পরে ইতালীতে পোপের কবরের উপর ব্রোঞ্জের নগ্ন নারীমূর্ত্তি বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পৃথিবীতে নিয়মই এই। ক্রিয়ার পরে নিয়তির ন্যায় অমোঘ প্রতিক্রিয়া।

যা কিছু সুন্দর তাই ইতালীতে শাশ্বত হয়ে উঠল। বহুনিন্দিত, দীর্ঘকাল অনাদৃত মানবদেহ পবিত্র দেবতার ধন হয়ে উঠল। মানবের অনুভব অতিমানবের মহিমায় শুদ্ধ বলে বিবেচিত হল। রূপকথার ও দেবগাথার নায়ক-নায়িকারা যে মানুষের মত ব্যবহার করবেন সে কথা প্রকাশে ধর্ম্মহানির ভয় রইল না। ধর্ম্মের শাসন এড়িয়ে শিল্পের সাধনা সম্ভব ছিল না, তবু গীর্জ্জার পৃষ্ঠপোষকতায়ও শিল্প জেগে উঠল। প্রিয়ার প্রতিলিপি দেবীর আলেখ্যের মধ্য দিয়ে ফুটে বের হল, দেবীর মূর্ত্তি প্রিয়াতে পর্য্যবসিত হল। বৈষ্ণব কবিতার সেই অমর ব্যাখ্যা—

"আর পাব কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা"

এই বাণী যেন রেণেসাঁসের মর্ম্মকথার প্রতিধ্বনি। মানুষকে দেবভক্তির আন্তরিকতা দিয়ে ও দেবতাকে মানবপ্রেমের অন্তরঙ্গতা দিয়ে শিল্পীরা দেখলেন ও আঁকলেন। তার ফলে ইতালীর চিত্রে আমরা পাই প্রকৃত মানুষের প্রতিমূর্ত্তি, তা সে দেবতারূপেই হোক বা মানবরূপেই হোক।

ফ্লোরেন্সের উফ্‌ফিৎসি (Uffizi) প্রাসাদে এই কথাই বারবার মনে হতে লাগল। বেচারী আন্দ্রিয়া দেল সার্তোর সব চিত্রেই একটী নারী ; নানা আবেষ্টনে, নানা ভঙ্গীতে, নানা বিষয়ে শুধু সেই এক নারী। দেখে মনে করা



ভেচ্চ্যো সেতু

একটুও কঠিন নয় কে সেই ভাগ্যবতী। শিল্পীর জীবন ছিল বড় করুণ। প্রথম জীবনে আন্দ্রির র‍্যাফেল প্রভৃতির সমকক্ষ প্রতিভা ছিল ; কিন্তু সে প্রতিভার বিকাশ প্রিয়ার রূপপাশে আড়ষ্ট হয়ে রইল। তিনি লুক্রিজিয়া ছাড়া কাউকে 'মডেল' করবেন না ; তার জন্য নিজের ক্ষমতার অপচয় ও প্রতিভার অপব্যবহারও করতে কুণ্ঠিত হলেন না। শিল্পী হিসাবে পরাজয়ের বেদনাকে

দ্বিগুণ করে তুলল এই আবিষ্কার যে, প্রিয়া তাঁর শিল্পে কোন প্রেরণা জাগাতে পারেন না। ব্রাউনিং-এর একটি কবিতায় তাঁর জীবনাকাশের করুণ আভাটুকু বড় সুন্দর করে ফোটান হয়েছে। লুক্রিজিয়া (লুক্রিশ) গোপন প্রণয়ীর অভিসারে যাবার জন্য ব্যাকুল অথচ তখনো আন্দ্রিয়া ভাবছেন তারই কথা। ইহলোকের ওপারে হয়ত তিনি আর একবার র‍্যাফেল, লিওনার্দো, এঞ্জেলো প্রভৃতির সঙ্গে প্রতিযোগিতার সুযোগ পাবেন কিন্তু একথাও ভাবছেন যে, পরাজয়ই তাঁর অদৃষ্টে অখণ্ডনীয়, কারণ প্রেয়সী তখনো যে পার্শ্ববর্ত্তিনী থাকবেন। *



ফ্লোরেন্সের দৃশ্য

চিত্র প্রতিলিপির কল্যাণে আজীবন ফ্লোরেন্সের সঙ্গে পরিচিত হয়েও একে রূপকথার রাজপুরী বলে মনে হচ্ছে, এত তার মাধুরী, এত রোমান্স। পিত্তি প্রাসাদে র‍্যাফেলের 'ম্যাডানো' দেখে ছেলেবেলার কথা মনে হল ;

* শিল্পী Greuze-এর 'ভগ্নকলস' চিত্রের কাহিনীও অনেকটা এমনি করুণ। তারও ভাগ্যে শিল্পপ্রতিমা ও জীবনপ্রেয়সী একই নারীতে পাবার প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল।

পায়ের তলার কাঁটা তুলে ফেলেছে যে প্রস্তরীভূত বালক তাকে ডাকতে ইচ্ছা হল। 'উফ্‌ফিৎসি' থেকে 'পিত্তি'তে আসবার পথে 'আর্ণো' নদীর উপরে "ভেচ্চো" সেতুর উপরের প্রাচীন বস্তু ও অলঙ্কারের দোকানগুলিকেও চিত্র-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মনে হল, আর মনে হল "দান্তের স্বপ্নের" রূপকের কথা যেখানে 'পপি' ফুলগুলি হচ্ছে নিদ্রা ও মহানিদ্রা; নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ হচ্ছে বিগতপ্রায় প্রাণ, আর দেবশিশুবাহিত লঘুশ্বেত মেঘ বিয়াত্রিচের আত্মা।

কে এর নাম দিয়েছিল ফ্লোরেন্স? এমন মধুর নাম ছাড়া একে আর কিছুতেই মানাত না। Duomoর (গীর্জ্জা) বাহিরটা যেন স্বপ্নে-দেখা একটা কারুকার্য্য; আর তারই উপযুক্ত Campanile হচ্ছে পাশের বর্ণবৈচিত্র্যময় স্তম্ভটী। Baptistryর তিনপাশের তিনটী দরজা দেখে মাইকেল এঞ্জেলো স্বর্গতোরণের উপযুক্ত বলেছিলেন। গীর্জ্জার উপর থেকে সহরের যে দৃশ্য পাওয়া যায় তা এক কথায় অপূর্ব্ব।

রূপের আদর্শ কি? আমাদের সকলেরই মনের গহন অতলে স্বপ্নসঙ্গিনী বা নিখিলমানসরঙ্গিণীর একটী আদর্শ থাকে যাকে ভাষায় প্রকাশ করতে গেলেই অন্তর্ধান করে, যে চিরকালই আমাদের সকল প্রশ্ন ও প্রাপ্তির অতীত তীরে থাকে। তবু আদর্শ আমরা একটা রাখিই—হয় তা দেহ-সৌষ্ঠবের, বা প্রকাশভঙ্গীর বা প্রাণময়তার। তাকে বর্ণনা করে কবি, ব্যঞ্জনা দেয় শিল্পী। আবহমানকাল তাই আমরা তাদের কাছে যাই আমাদের স্বপ্নের মূর্ত্তির, কল্পনার প্রকাশের জন্য। শিল্পের ইতিহাসে তাই দেখি অনন্ত রূপের শোভাযাত্রা। প্রস্তরযুগে নারী ছিল বিশেষ করে বংশের জননী—যে বংশকে বরফের যুগের ইয়োরোপের নির্ম্মম শীতের হাত থেকে জীবন রক্ষা করতে হত। তাই প্রস্তরযুগের নারী হচ্ছে স্থূলাঙ্গী বীরাঙ্গনা, শুধু গজগামিনী নয়, সাক্ষাৎ গজেন্দ্রাণী। গুহামানব গুহাগাত্রে বাইসন পশুর ছবি আঁকত বহু বাইসন শিকার-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায়। এতেই তার মন কিভাবে শিল্পকে গ্রহণ করেছিল তা বুঝা যাবে। যুগে যুগে পুরুষ যেভাবে তার সঙ্গিনীকে আকাঙ্ক্ষা

করেছে সেভাবেই তাকে এঁকেছে, নারীও সেভাবেই পুরুষের সামনে আবির্ভূত হয়েছে। গ্রীক আদর্শ ছিল সৌষ্ঠব ও সামঞ্জস্যময় নিশ্ছিদ্র গঠনভঙ্গিমার রূপ; ভগবান্ যে তাঁর নিজের আকৃতিতে মানুষ গড়েছিলেন ধর্ম্মের এই শিক্ষা অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশ করে গ্রীক শিল্পীরা মানবীর আকারে দেবীকে রূপ দিলেন; তাদের ভিনাস হচ্ছেন স্বর্গীয় বা স্বর্গসুষমাময় নারীর শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি। তাদের কাছে তিলোত্তমা সুন্দরী নাগরী ফ্রাইনি শ্রেষ্ঠ দেবসুন্দরীর মানবীরূপের প্রতীক; এবং এ কল্পনায় তাঁরা দেশের শিল্পরসিকদের সকলেরই অন্তরের সমর্থন পেয়েছিলেন। আর্টের সুবর্ণযুগে ইতালির পার্ব্বত্যসহরের রূপসীরা (ম্যাডোনার) দেবমাতার 'মডেল' রূপে দাঁড়াল; তারাই প্রাচীন ধর্ম্মকাহিনীর দেবীদের চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে রূপ দিল। লিওনার্দোর 'মোনা লিসা'র কথা না-ই ধরলাম; আরো অন্যান্য শিল্পীরা সবাই মানবীর মূর্ত্তিতে দেবীকে উপলব্ধি করেছিলেন। করেজ্জিয়ো সব প্রাচীন দেবকাহিনীর ছবিতেই শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের ভিনাস সাজাতেন। ফ্লেমিশ ও ডাচ্ শিল্পীরাও তাই করতেন; কিন্তু তাদের দেশের সৌন্দর্য্যের মানদণ্ড সকলের কাছে আকর্ষণীয় নয়; তাই রুবেন্স ও রেমব্রাণ্টের হাসিখুসী গৃহিণীরা কখনো সৌন্দর্য্যজগতে চাঞ্চল্য আনতে পারেন নি। চিত্রশিল্পের আর একটী শতাব্দীতে শিল্পী মানবীকে আঁকতে বসে দেবীর কথা ভুলেই গেলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসীরা পম্পাদুর, দ্যুবারী প্রভৃতি রাজ-প্রেয়সীদের কক্ষসজ্জায় মনোনিবেশ করলেন ও ইংরেজ শিল্পিপ্রধানরা অভি-জাতদের চিত্ররূপ নিয়ে ব্যস্ত রইলেন। শেষোক্ত চিত্রগুলি এখন আমেরিকান লক্ষপতিদের আদরের সামগ্রী—কারণ এই হচ্ছে মার্কিন ধনীর পূর্ব্বপুরুষ-পরিচয়ের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপন ও উপকরণ।

তবু ত তারা মানবী। কিন্তু চিত্ররাজ্যে আরো বহুবিধ দেবী বা মানবী প্রতিকৃতি আছে যা মানবের আকৃতিতে গঠন করা হয়েছে কি না সন্দেহ। রসেটীর যুগের সারসকণ্ঠী বেত্রবতীদের আকৃতি বা বর্ত্তমান যুগের Cubistদের

নারীচিত্রের অনুকরণে যদি মানবীকে ভাবতে হয় তাহলে ভাস্করের যন্ত্রপাতি-গুলি প্রস্তরের পরিবর্তে রক্তমাংসের দেহের উপরই চালাতে হবে। রুচির



ভিনাস

বৈচিত্র্য একেই বলে। তবু যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন রুচি ও শিল্পধারার প্লাবন প্রতিহত করে গ্রীসের সৌন্দর্য্যসৃষ্টি আপন মহিমায় শ্রেষ্ঠ সম্মান পেয়ে আসবে।

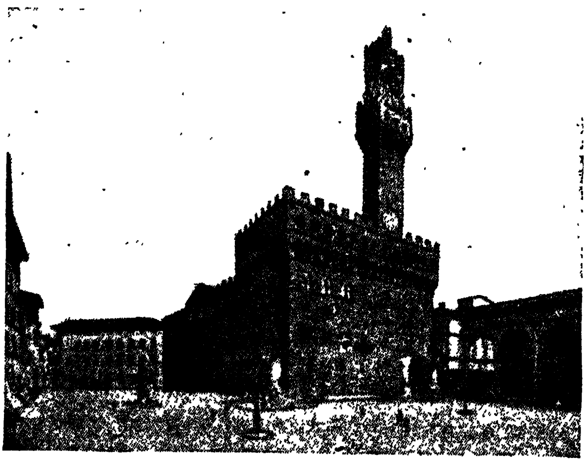
মিলোর ভিনাস বা মেদিচির ভিনাসমূর্ত্তি চিরকাল জগতে শ্রেষ্ঠ মানবীমূর্ত্তি বলে পূজা পাবে। চকোলেট বাক্সের রূপসীমূর্ত্তি দেখতে অভ্যস্ত ও সন্তুষ্ট শিক্ষাহীন লোকেরও চোখে এ মূর্ত্তি নূতন আলোক, নূতন স্বপ্নলোকের সন্ধান দেবে।

একটী ছবির কথা বাদ দিলে ফ্লোরেন্সের পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। 'ভিনাসের জন্ম' ছবিটী রবীন্দ্রনাথের উর্ব্বশী কবিতার বহু পঙ্ক্তি স্মরণ করিয়ে দেয়। মন্ত্রমুগ্ধ মহাসিন্ধু উচ্ছ্বসিত সহস্র ঊর্ম্মিমালার ফণা অবনত করে লুটিয়ে পড়েছে চিরযৌবনার পায়ের কাছে। ভিনাস বা উর্ব্বশী যে নামই দেওয়া যাক, শিল্পীর স্বপ্নপ্রতিমার পরিচয় সে শুধু নিজে; "নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ"; "বিকশিত বিশ্ববাসনার অরবিন্দে'র" উপর 'অতি লঘুভার' চরণ রেখে দাঁড়িয়ে আছে ভিনাস।

বিধিলিপি বিচিত্র। এই ঐতিহাসিক অনিন্দ্যসুন্দর গৃহগুলি চিরদিনই মানুষের আনন্দবর্দ্ধন করেনি। বার্গেল্লো প্রাসাদটীর সুন্দর অলিন্দ চিরদিনই শান্ত সৌন্দর্য্যের স্থান ছিল না। একসময় এখানে বহু ব্যক্তি ফাঁসীকাঠে প্রাণ দিয়েছে; ও মিউজিয়মে রক্ষিত বিচিত্র অস্ত্রসম্পদ্ ভিন্নদৃশ্যের অভিনয়ে ব্যবহার করা হত। এখানে প্রথমে ছিল কারাগার, পরে হল নগররক্ষীদের প্রধান কার্য্যালয়। এমন সুন্দর প্রাসাদের সঙ্গে এমন অসুন্দর কার্য্যের সম্বন্ধ চিন্তা করতে একটু কষ্টবোধ হয়। মাইকেল এঞ্জেলোর 'ব্যাকাস' দেখতে এসে একথা না মনে হয়ে যেতে পারে না। 'লান্ৎসি' ভবনের তোরণে দাঁড়িয়ে আছে চেল্লিনির অমরসৃষ্টি 'Perseus', 'ভেচ্চি' প্রাসাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে (Neptune) বরুণদেব; কিন্তু এই ভবন বিভিন্ন যুগে নাগরিক ভবন, কারাগার ও প্রসাদরূপে ব্যবহার করা হয়েছে; এবং এখন হচ্ছে গভর্ণমেণ্টের অফিস। এইখানেই ফ্লোরেন্সের কর্ম্ম ও ধর্ম্মের বীরসন্ন্যাসী সাভোনারোলা বন্দী ছিলেন ও বাহিরের চত্বরে তাঁর জীবন্তে অগ্নিদাহ করা হয়। অদ্ভুত ভাগ্য এই নগরের! এর ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত হচ্ছেন

তিনজন বিভিন্ন বিভাগের মহামানব এবং মাইকেল এঞ্জেলো, গ্যালিলিও ও মেকিয়াভেলি তিনজনেরই স্মৃতি রয়েছে একই মন্দিরে।

মিলান, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স, ভেনিস প্রভৃতি স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে থেকেই জগতের সভ্যতাকে দিয়েছে সহস্র অবদান যার তুলনা একীভূত ইতালীতে কোনদিন নাও মিলতে পারে। প্রত্যেকটী ছোট রাষ্ট্রে জনমত থাকত প্রবল



ভেচ্চি প্রাসাদ

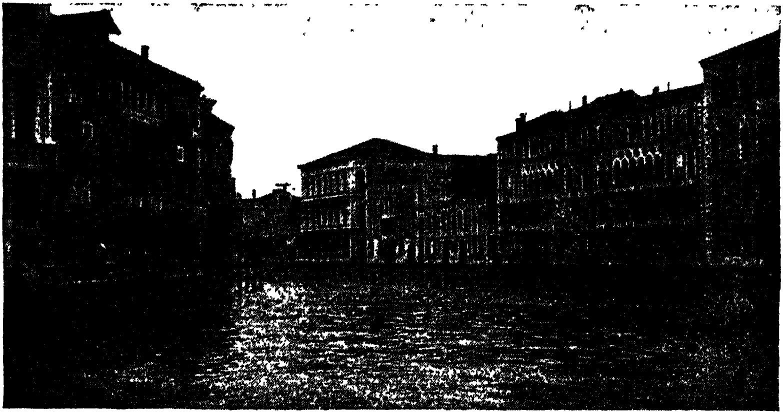
ও সংহত; প্রত্যেক নাগরিকের চোখ থাকত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর; জনসাধারণের করতালির মধ্যে বন্ধুর উৎসাহ ও প্রশংসা ধ্বনিত হয়ে উঠত। এইভাবে উৎসাহিত ছোট রাষ্ট্রগুলির দান একটী ইতালীর পরিবর্তে বহু দেশের মিলিত দানের মত সম্ভার দিয়েছে। তাই ইতালীর প্রত্যেক নগরকে অনুভব করতে হবে এক একটী দেশ হিসাবে—তাদের বিভিন্ন সম্পদ ও শিল্পধারাকে একেবারে এক মনে করলে প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাবে না।

To see Venice and then die চলচ্চিত্রের কল্যাণে এই ছবির মত সুন্দর সহরটীর সঙ্গে পূর্ব্ব পরিচয় নেই এমন বিদেশী পাওয়া যাবে না। কিন্তু ছবি দেখে যা ধারণা হয় সেই কল্পনার ভেনিসের চেয়ে বাস্তবের ভেনিস অনেক বেশী সুন্দর। এই একটী জায়গা যেখানে "Yarrow Unvisited" এর চেয়ে "Yarrow Visited" বেশী বিস্ময় জাগায়, বেশী আনন্দ দেয়।

সমস্ত সহরটীকে রূপ দিয়েছে একটী খাল, বলয় যেমন করে বাহুলতার রূপকে বন্ধন দিয়ে ঘিরে রেখে পূর্ণতা দেয়। এই খালটীই হচ্ছে এখানকার প্রধান রাজপথ; এরই দুধারে অভিজাতদের প্রাসাদমালা, এতদিনের জলের লবণস্পর্শেও খারাপ হয়ে যায়নি। গণ্ডোলিয়ের সামনের দিকে মুখ রেখে পিছনের poppa তে দাঁড়িয়ে একটী দাঁড়ে গণ্ডোলা চালায়। যাত্রীর জন্য একটী নীচু ঘর (felze) থাকে। Belliniর ছবিতে যে রকম দুধারে খোলা হাল্কা কাঠামোর উপর চাপান সোনালী পাড় ও নানারঙে সাজান গণ্ডোলা দেখি তা আজকাল দেখা যায় না। তবু যেগুলি এখন আছে তাতেও অন্তত জলবিহার না করলে ভেনিসে আসাই বৃথা।

পৃথিবীর ইতিহাসে ভেনিসের রাষ্ট্রগত মূল্যের তুলনা সহজে পাওয়া যায় না। প্রাচ্যের আক্রমণের বিরুদ্ধে ইয়োরোপের প্রহরী এই ক্ষুদ্র সহরটী একটী নূতন রাষ্ট্রতন্ত্র গঠন করেছিল। নৌযুদ্ধের বিশারদতায় এর সমকক্ষ পাওয়া যেত না। ঐশ্বর্য্য ও বিলাসেও মধ্যযুগে ভেনিস ছিল ইয়োরোপের ঈর্ষ্যা ও আদর্শ। বিভিন্ন শিল্পধারাকে আশ্রয় করে সে উদার মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে এবং বাইজাণ্টাইন, গথিক, পূর্ব্ব-রেণেসাঁস ও উত্তর-রেণেসাঁসের কলাকৌশলকে বিভিন্ন যুগে গ্রহণ করতে ইতস্তত করেনি। সাধারণভাবে বলতে গেলে নানা প্রস্তরমণ্ডিত মোজায়েকশোভিত সেণ্ট মার্কের মন্দিরে বাইজাণ্টাইন শিল্প আর ঠিক তার পাশেই ডিউকের প্রাসাদে গথিক শিল্পের উদাহরণ পাই। অথচ ভেনিসের একাকিত্ব ও ইয়োরোপের প্রান্তে অবস্থিতির জন্য দুটী শিল্পধারারই বিকাশ হয়েছে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে। ইউরোপের

প্রান্তেই বলতে হবে, কারণ তার দুয়ারে সতত তুরস্ক সেনাদল হানা দিয়েছে ও তুরস্ক সাম্রাজ্য পাহারা দিয়েছে। স্বাধীনতা যেমন অক্ষুণ্ণ ছিল বহু শতাব্দী ধরে রাজনীতিক ইতিহাসে, তেমনি ছিল শিল্পের বিকাশে। ধর্ম্মপ্রাণতা শিল্পকে দেয়নি কোন বাধা; প্রাদেশিকতা কলঙ্কিত করেনি তার উদার মর্য্যাদা।

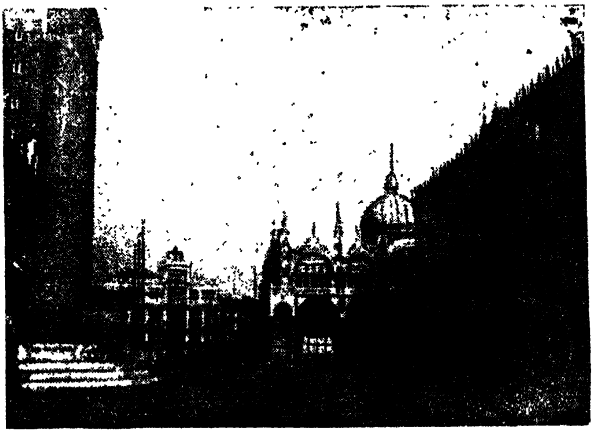


ভেনিস

ইতালীর আকাশের অনুপম নীলিমা ও lagoonএর বেগুনি আভায় মিলানো সন্ধ্যার অস্তরাগে 'ডোজের' (doge) প্রাসাদের মর্ম্মরশিল্পকে জালির সূক্ষ্মকাজ বলে ভ্রম হয়। আশেপাশের অলিগলিতে কাঁচের কারখানায় যে অপরূপ সূক্ষ্ম ও সুকুমার জিনিষগুলি তৈরি হয় সেগুলি যে এই প্রাসাদের শিল্পীদের বংশধরদেরই হাতের সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। আর সুচিত্রিত চামড়ার বইয়ের ঢাকনা-গুলিও যে এদেরই হাতের কাজ তাও সহজেই বুঝা যায়। শুধু শিল্পকলা নয়, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার দিক্ দিয়েও ভেনিস অষ্টাদশ শতাব্দীর সীমার বাইরে পা বাড়াতে কুণ্ঠিত। সান মার্কোর গম্বুজ ও মোজাইকের কারুকার্য্যের উপর যখন সন্ধ্যার ম্লান আলো বঙ্কিম

ভঙ্গীতে এসে পড়ে তখন মন্দিরচত্বরের উপর ঘনায়মান অন্ধকারে সমবেত অসম্ভব রকম লোভী পায়রার দলকে দেখে সেই কথাই মনে হয়। এদের পূর্ব্বপুরুষরা দান্তে ও পেত্রার্কের হাত থেকে খাবার নিয়ে খেয়েছিল; কাসানোভা যখন এখানে ব'সে তার অসংখ্য প্রণয়িনীর কাছে চিঠি লিখত তখন তার চারপাশে অক্লান্ত কলগুঞ্জনে বিহ্বল করে তুলত।

কাসানোভার কাহিনী হয় ত অতিরঞ্জিত। তার যুগে অত্যুক্তিই ছিল বিলাস আর বিলাসিতাই ছিল গৌরবের। ভেনিসের জীবনের চিত্রকর গার্দির



সান্‌মার্কোর চত্বর

(Guardi) ছবিতেও তারই প্রমাণ পাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভেনিসের বিলাসলীলা ও ছলাকলার পূর্ণ প্রতিরূপ তার ছবিতে। গম্ভীর রাষ্ট্রতন্ত্রের ব্যবস্থাপক-দলের চোখে অধীর ভোগলালসা; domino শোভিতা মহিলাদের পাশে যোদ্ধাদের বীরত্বহীন কোমলভাব। তাসপাশার কেন্দ্রস্থল অথবা ridottoতে পরচর্চ্চা ও নৌকাবিহার সমান আনন্দদায়ক ছিল। এই হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভেনিসের ইতিহাস। অসংযম, অসচ্চরিত্রতা ও তার

আবরণস্বরূপ আড়ম্বরময় সাজসজ্জার বহরে ভারাক্রান্ত সহরের দুষিত জলের ঢেউ শুধু রাষ্ট্রের মেরুদণ্ডস্বরূপ সম্ভ্রান্তবংশগুলিকে ডুবিয়ে ক্ষান্ত হল না, গভীর রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসীর আশ্রম ও সন্ন্যাসিনীর মঠে গিয়ে পৌছাল। ভেনিসের অভিজাতরা বীরের অসি ভুলে বিলাসের বাঁশী তুলে নিলেন, এবং ইয়োরোপে যেখানে যত সুখের পায়রা ছিল সবাই এসে তাদের সঙ্গে মেতে গেল। গ্যার্দির ছবিগুলির মধ্যে যা আকৃষ্ট করে তা হচ্ছে এই যে এত প্রাচীন গৌরবময় রাষ্ট্রতন্ত্রে যখন মৃত্যুর বিষ ধীরে ধীরে দুর্নিবারভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তখনো এই লোকদের মুখে তাদের জীবনের ব্যর্থতা সম্বন্ধে সচেতনতার ছাপ নেই।

তেমনই অনুশোচনাও নেই এদের জীবনে। এরা কৃতকর্ম্মের জন্য গত-জীবনের জন্য অনুতাপ করবে না। ব্রাউনিংএর আর একটী কবিতা মনে পড়ে। ডিউক ফার্ডিনাণ্ড রিকার্ডি-বধূকে কামনা করে প্রত্যহ রিকার্ডি প্রাসাদের পাশ দিয়ে যান, আর বধূ বাতায়নে সপ্রেম দৃষ্টি বিনিময় করেন। তারা পলায়নের বন্দোবস্ত করলেন কিন্তু পালাতে পারলেন না। জীবনে তাদের সার হল শুধু দৃষ্টিবিনিময়। কিন্তু হায়, যৌবনস্বপ্ন ক্ষণস্থায়ী; তার ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণ মিলিয়ে যেতে লাগল; প্রেমেও এল মলিনতা। সে স্বপ্ন ও সে স্মৃতিকে স্থায়ী করবার জন্য বধূ তার আবক্ষমূর্ত্তি জানালায় ও ডিউক তার প্রতিমূর্ত্তি নীচের উদ্যানে স্থাপন করলেন। অনন্তপ্রেম সান্তমূর্ত্তিতে পরিণত হল। কবি বলেন, তাদের জীবনে ব্যর্থতার অভিশাপ লেগেছে মিলন হয়নি বলে; প্রেমের শূন্যতা রয়ে গেল মিলনের অপূর্ণতায়। প্রদীপ জ্বালান হয় নি; শুভযাত্রা করা হয়নি, এই হল তাদের জীবনে পাপ। ব্রাউনিংএর জীবনবাদে অনুশোচনার স্থান নেই—হোক্ না সে জীবন ভোগে মগ্ন, যদি তাই জীবনের আদর্শ হয়ে থাকে।

আশ্চর্য্যের বিষয় সেই ভেনেসিয়ানরা শুধু চিত্রকরের তুলিকাতেই বিস্মৃতির গর্ভ এড়িয়ে বেঁচে রইল যদিও সেই ভেনিস এখনো পূর্ণমাত্রায় প্রাণময়।

এখানে এখন জলপথে ষ্টীমার চলে দুপাশের হোটেলগুলির বৈদ্যুতিক আলোর প্রতিচ্ছায়ায় দোলা লাগিয়ে; মুসোলিনীর কল্যাণে বৃহত্তর ভেনিসে হয়ত একদিন মোটরগাড়ীও চলবে, তবু অন্ধকারপ্রায় পুরাণো প্রাসাদগুলির ছায়ায় ঢাকা জলের তৈলাক্ত চাকচিক্যের উপর দিয়ে যখন কোন গণ্ডোলায় রঙীন কাগজের বাতির আলোয় মৃদু গীতার ধ্বনির সঙ্গে O Sole Mio গান চঞ্চল জলরাশির কল্লোলের সঙ্গে তাল রাখতে রাখতে ভেসে যাবে তখনি বিচিত্র ভেনিসের পুরাতন ও প্রকৃত রূপটী ধরা পড়বে।

একটী দুর্লভ রাত্রি। বাতায়নের বাহির থেকেই পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ বুঝতে পারা যাচ্ছে আর গ্র্যাণ্ড ক্যানালের ঝিকিমিকি আলোর টুকরা সাইপ্রেশ-শ্রেণীর ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে। এমন মদির রাত্রে আমেরিকান টুরিষ্টের মত "অন্ত রজনীর ফরাসী স্পেশ্যালিটী"র ভোজনের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠে না। উদ্যানপথে ঝাউকুঞ্জের পাশে পাশে প্রস্তরমূর্ত্তিগুলি আহ্বান করছে; ওই পথেই আজ বাইরে যাওয়া উচিত।

ওই পথ কাউকে রোমে নিয়ে যেতে পারবে না যদিও রোমের অহঙ্কার ছিল যে, সব পথ এসে রোমে মিশে যাবে। এ পথ সাঙ্গ হল ভেনিসের জলপথে।

সান মার্কোর চত্বরে আজ এ কী ব্যাকুলতা, মদির চঞ্চলতা। সারাদিন কেটে গেছে 'ডোজের' প্রাসাদে তিৎসিয়ানের ছবিগুলির সামনে; আজ রাত্রেও দেখি সেই তিৎসিয়ানের রং—সেই বর্ণমিশ্রণের সুষমা ইতালীর আকাশে, লিডোর সুনীল স্বচ্ছ জলরাশিতে। এমন কি, তিন্তোরেত্তোর পৃথিবীর বৃহত্তম চিত্র 'প্যারাডাইস'কেও তিৎসিয়ানের বলে ভুল হল বার বার।

ভেনিসের বাতাস আমার মনে ওলটপালট লাগিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেক পথচারী আমার চোখে কী নূতন আলোকে প্রতিভাত হচ্ছে। যে সার্থকতা এদের জীবনে নেই হয়ত, যে অস্তিত্বের কথা ভাবেনি এরা স্বপ্নেও, সেই গৌরবে এদের মহিমান্বিত মনে হচ্ছে। সাধারণ ভোজন-শালায় অতি



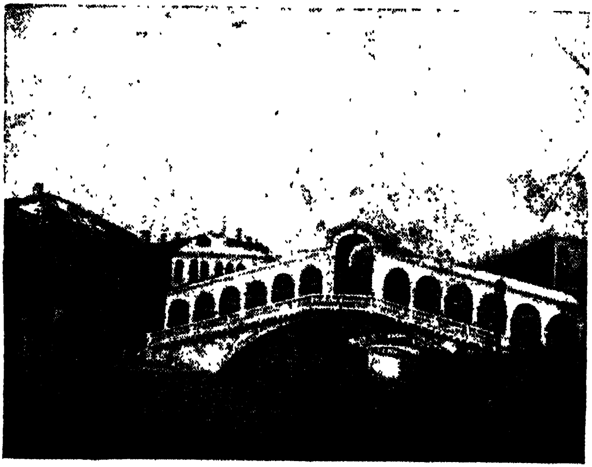
প্যারাডাইস

সাধারণ যে ভিক্ষুকশিল্পী ম্যাণ্ডোলিন বাজিয়ে ভিক্ষা করছে, রিয়াল্‌টো সেতুর তলায় যে গণ্ডোলার মাঝি নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের মত হয়ে কম্পমান ছোট তরীতে ত্রিভঙ্গিম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সবাই যেন চিত্র থেকে নেমে এসেছে। অপরিচ্ছন্ন অপরিসর গলিপথের যে পথিক সেও আজ রাত্রিতে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বুঝি বেরিয়েছে। চলতে চলতে ভুল করে কত পথের সহজ ভুলকেও ঠিক বলে মনে করে নিলাম। উদ্‌ভ্রান্ত মনের সুযোগ নিয়ে এক বৃদ্ধ তার হৃদয়-বিদারক ও নিরাশাময় প্রেমের কাহিনীও শুনিয়ে দিল।

সে গল্পের নায়ক তো আমিও হতে পারতাম। আরো অনেকেরই মনে একটু আঁচড় কাটতে পারলে হয়ত এমনই ব্যর্থ বেদনার কাহিনী বের হয়ে পড়বে। এই বৃদ্ধের মতই কতজন নীড় বাঁধবার সাধ ত্যাগ করে প্রিয়গৃহ ও প্রিয়াসান্নিধ্য থেকে দূরে চলে গেছে দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে, আমাজন নদের তীরের হরিৎ প্রান্তরে, অথবা আফ্রিকার দগ্ধ ঊষর অরণ্যানীর মধ্যে। তারপর, তারপর কত জনেরই যৌবনস্বপ্নের করুণ অবসান হয়েছে এই বৃদ্ধেরই মত বার্দ্ধক্যের আবিষ্কারে যে প্রেম কোন্ কৈশোরের চঞ্চলতার সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞাতসারে মনের ধূসর মরুতে মিলিয়ে গিয়েছে। তখন হয়ত জীবনে আর কিছু সম্বল থাকে না, না কোন সন্তোষ, না কোন সান্ত্বনা। একথা ভাবতেও অজ্ঞাতসারে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। Bridge of Sighs-তলায় জলরাশিও যেন নিঃশ্বাস ফেলল: সমগ্র মধুরজনী সে দীর্ঘশ্বাসে সাড়া দিবার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

হোক্ সে প্রবঞ্চনা। না হয় লোকে মনে করুক যে, অনভিজ্ঞের উপর বারুণীর প্রভাবেই নিশ্চয় এমন ভুল সম্ভব হয়েছিল। বিজ্ঞ ও কাজের লোকরা অনুকম্পার অমূল্য মৃদুহাস্য দিয়েই সে রাত্রিকে সম্মান দিন। বিদেশে যে পর্য্যটন করতে গিয়ে ব্যিডেকারের গ্রন্থের 'প্রাসাদের রাজপুত্রী' বা 'দুর্গম দুর্গের অন্ধকার সুরঙ্গপথ' প্রভৃতি ছাড়া অন্য কোন কাহিনী বিশ্বাস করে ও খুঁজে বেড়ায় এ সংসারে তাকে বোকাই বলে। এসব করা ভদ্রোচিত

অর্থাৎ 'রেস্পেক্টেবল' নয়। না হোক্। আমি সেই গল্পে এখনো বিশ্বাস করি। না কোরে উপায় কি? ভেনিসে যে মন্দির চাঁদিনীরাতে রিয়াল্টোর তলায় সুনীল জলরাশি খেলা করে বেড়ায়। ভেনিসের স্মৃতি সব সময় মনে আসবে না। সানমার্কোর চূড়া যে অস্পষ্ট আলোকে তাকে শেষ দেখেছিলাম



রিয়াল্টো সেতু

তাতে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। হয়ত আর কোন বিমুগ্ধ নিশীথে চোখে স্বপ্নের পরশ ও হৃদয়ে সহানুভূতির করুণতা নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এসে ভাবতে বসব না। কাজের ভিড়ে সে সব দিনের অস্ফুট গীতার ও ম্যাণ্ডো-লিনের সুরের রেশ এমনি মিলিয়ে যাচ্ছে। সম্ভবত ভেনিসের রাত্রিগুলি শুধু স্বপ্নই। কিন্তু সে রাত্রিটী ত স্বপ্ন নয়।

মিলান! মিলান নামটীর সঙ্গে যেন ইতালীর প্রাণের সঙ্গীত মিশান আছে। ভিক্তর ইমানুয়েল গ্যালারীর ছায়াময় বিশালতা যেন গানের রেশে পরিপূর্ণ। বিশাল তোরণ, তার বিস্তৃত সম্মুখভাগ ইয়োরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীর্জ্জাটাকে লুপ্ত করে দিবার স্পর্দ্ধা রাখে। কাঁচ ছাড়া অন্য কোন পদার্থ এখানে চোখেই পড়ে না। সংস্কৃত যুগ হলে এর নাম দিতাম 'স্ফটিক-তোরণ'।



রোমের দৃশ্য

ইতালার সহরগুলির বিশেষত্ব এই "গ্যালেরিয়া"। সব সহরেরই একটী সামাজিক কেন্দ্রস্থল আছে এবং তা হচ্ছে এই গ্যালারী, না হয় নগরোপকণ্ঠে কোন শৈলশিখরে প্রমোদোদ্যান। গ্যালারীর চারদিকে সুশোভন দোকান পাট, 'রিস্তোরাস্তি' ও আরও কত কিছু। ভিক্টর ইমানুয়েল

গ্যালারীর একপাশে সাত হাজার প্রতিমূর্ত্তিময় "পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য" ("la huitieme merveille du monde") এই মন্দির, অন্যপাশে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির স্মৃতিস্তম্ভ ও স্কালা থিয়েটার। গ্যালারির চারদিকের বিস্তৃত বাহুর মধ্যে চারটী জনস্রোত প্রবাহিত হয়; আর কেন্দ্রস্থলে আছে কাফে বিফ্‌ফি। মিলানের প্রাণ খুঁজতে গেলে তার মন্দিরে নয়, ঐশ্বর্য্যময় রাজবংশের কবরে নয়, এই কাফেতে আসতে হবে। সবাই সুবেশে সুরুচিপূর্ণ ভাবভঙ্গীতে রসালাপে ব্যস্ত; এধারে ওধারে পদধ্বনি বা কাউকে অভিনন্দন, উপরের কাঁচের skylightটী এই লোকদের কথার প্রতিধ্বনিতে গম্‌গম্‌ করছে। এই হচ্ছে পৃথিবীর গায়কদের শ্রেষ্ঠ পণ্যশালা; চরম উচ্চাকাঙ্ক্ষার নন্দনকানন।

পৃথিবীর সব দেশ থেকে মন্দগায়ক যশঃপ্রার্থীর দল এখানে আসছে বহ্নিমুখবিবিক্ষু পতঙ্গদলের মত উচ্চাকাঙ্ক্ষায় আকৃষ্ট হয়ে। বেচারীর দল। তারা আজ মুখে প্রশান্তির ভাব দেখিয়ে সাধারণ 'ত্রাত্তোরিয়ায়' ম্যাকা-রোণি খাচ্ছে; মনে আশা একদিন তাদের পদপ্রান্তে কুবেরের ঐশ্বর্য্য ও শিরচূড়ায় সরস্বতীর কিরীট এসে জড়ো হবে। কোন্‌ গায়ক এখানে আসেন নি? প্রথম চেষ্টায় মিলানের কাছাকাছি কোন সহরে একটু কাজ পেলে খবরের কাগজে একটু নাম উল্লেখ দেখতে পেলে বেঁচে যাবেন। প্রবীণের দল নিজেদের অতীত মূল্য ও বর্ত্তমান মানের কথা শুনিয়ে নবীনদের মনে ভয় এনে দেবার চেষ্টায় ব্যস্ত; অতীতের এরা ভগ্নদূত! একদল সেরা অপেরা-গায়ক তাদের কোনো হ্রদের তীরের প্রাসাদ ও কুঞ্জকাননের গল্প করছে; তারা এই গানের রাজ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী; অন্যদল তাদের নিজেদের দুর্ভাগ্যের নিন্দা করছে। তবু কত আশা।

সঙ্গীততীর্থের মধ্যে স্কালা হচ্ছে কাশী; মরজগতের মধ্যে অমরাবতী। এখানে পাদপ্রদীপ যার আনন উদ্ভাসিত করেছে তার ভাগ্যাকাশ উজ্জ্বল। কিন্তু এই আশামরীচিকা কত ভাগ্যকে অভিশপ্ত করে লুপ্ত হয়ে গেছে তার

ইয়ত্তা নেই। স্কালায় দেখলাম জাতীয় ললিতকলা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য যে শিক্ষাগার আছে তাতে একদল বালিকা প্রাণপণে শিক্ষানবিশী করছে। আবার মনে হল বেচারী এরা কত লীলায়িত গতিচ্ছন্দেই না ঘুরে বেড়াচ্ছে; এদের মধ্যে কতজনকেই হয়ত ঘোর নিরাশা ঢাকতে হবে হাসিমুখে।



সিবাষ্টিয়ান

স্বর্ণকেশী ইংরেজবালিকা, তুষারশুভ্রাঙ্গী রুষীয়া, বহ্নিশিখাসমা হিস্পানী, হাস্যকৌতুকের লীলানির্ঝর প্যারিসানা, কত দেশ থেকে এরা এসেছে; সহজ অথচ আত্মবিশ্বাসময় ভঙ্গীতে চলতে চলতে কলহাস্যে আলাপের মধ্যেও

আশার আলোর স্বপ্ন মনের মধ্যে দেখতে হবে। বাইরে বেরিয়ে এসে কিন্তু এরা ভীতা চকিতা হরিণীর মত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এরা কি শুধু এ মন্দিরের বাহির দুয়ার পর্য্যন্তই পৌঁছবে? এতগুলি বালিকা; কজনের ভাগ্যে রঙ্গমঞ্চের উজ্জ্বল আলোক-দীপ্তি আছে? স্কালা মিউজিয়মের অমর শিল্পী ব্বার্দির স্মৃতি-বিজড়িত দ্রষ্টব্যগুলির কথা আর মনে পড়ছে না; শুধু ভাবছি এদের মধ্যে কেহ হয়ত জুদিত্তা পাস্তার মত মনোমোহিনী ও বিশ্ব-বিজয়িনী হবে; আর বাকী সব?

Niobe of Nations! রোম অবর্ণনীয়। প্রাচীন বিশাল রোম; অতিমানবের রোম।

শুধু রোমান নয়, রোমের সঙ্গে যে সংস্পর্শে এসেছে সেই অতিমানবের মত কিছু করে গেছে। তার চিহ্ন যেদিকে তাকাই সেদিকেই। রোম যদি শুধু ভ্যাটিকান প্রাসাদ ও সেণ্ট পিটার্সেই শেষ হত তবু এই সেই রোমই থাকত; সব রাজপথই এদিকে নিয়ে আসত।

রূপ ভিন্ন মানুষের চলে না। আমরা যখন নিরাকার রূপহীনের কথা ভাবি তখনো অলক্ষ্যে, হয়ত অজ্ঞাতেই, তাঁরও একটী রূপ মনের মধ্যে মূর্ত্তি ধরে ফুটে উঠে। তরঙ্গের গতির মত, পুষ্পের সৌরভের মত, শিশিরসিক্ত তৃণদলের মুক্তালাবণ্যের মত গোপনে মনে তা একটী নিভৃত স্থান অধিকার করে। বৈজ্ঞানিক জগতেও যার কোন রূপ নেই সে আকাশের অসীম মোহন নীলিমা না থাকলে জীবনে আসত জড়তা, মনে থাকত না মুক্তি। সান্ধ্য গগনের তরল রক্তহৃদয় বেয়ে সীমা যেখানে অসীমের নিবিড় সঙ্গ চায়, আকাশ ও ধরণী যেখানে নিভৃত মিলনে আত্মহারা সেখানে আমরা কত রূপ ও কল্পনা সৃষ্টি করে নিয়েছি। সেজন্যই ত দিগ্বলয়রেখা এত সুন্দর, তার মধ্যে এত অমরজ্যোতির অনির্ব্বাণ অক্ষরের সন্ধান পাই।

"রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করে।"

খৃষ্টমাসের দিনে রোমে খৃষ্টানের উপাসনা দেখে সেই কথাই মনে হল। পৌত্তলিক বলতে আমরা ঈশ্বরের রূপের পূজারী মনে করি। আমাদেরই মত এরাও রূপ আরাধনা কম করে না। খৃষ্টজীবন ও অন্যান্য সাধু কাহিনীর কত বিভিন্ন ঘটনা ও ব্যঞ্জনার প্রতিমূর্ত্তি আছে সেণ্ট পিটার্সে; তার সামনে নতজানু হয়ে কত উপাসনা, পাপ-নিবেদন, ধূপসৌরভে দীপসৌষ্ঠবে কত প্রাত্যহিক পূজারতি। বৎসরের শ্রেষ্ঠ খৃষ্ট উৎসবের দিনে পোপের প্রার্থনার গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্রপাঠের সঙ্গে উচ্চারণ করলাম Santa Maria Madre. সেণ্ট পিটারের যে ব্রোঞ্জ প্রতিমূর্ত্তির একটী পদপ্রান্ত ভক্ত বিশ্বাসীদের চুম্বনে চুম্বনে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেছে সেখানে এসে রোমের 'ক্যো ভাডিস' মন্দিরে যেখানে নীরোর অত্যাচারে পলায়মান সেণ্ট পিটারকে খৃষ্ট দর্শন দিয়েছিলেন সেখানকার প্রস্তরে তাঁর পদচিহ্নের কথা মনে পড়ল। হিন্দুর মতই রোম্যান ক্যাথলিকেরও ধর্ম্মের মধ্যে কত কাব্যের প্রকাশ, কত কাহিনী, কত কল্পনা হৃদয়ঙ্গম করলাম। শুধু কি আমরাই রূপসাধনা করি?

অপরূপ রূপ প্রাচীন রোমের। বিরাট্ মানব ছিল সেই জাতি যারা এই সব জয়স্তম্ভ ও ফোরাম সৃষ্টি ও কল্পনা করেছে—যাদের বিজয়-অভিযানকে অভিনন্দন করবার জন্য রাজপথ নির্ম্মাণ করতে হত; যারা উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে পঞ্চাশ সহস্র লোকের স্থান দিত একটী কলিসিয়ামে। প্রাচীন ধ্বংস-স্তূপের সহস্র পাষাণজিহ্বা অনিবার তার মৌনবাণী বিদেশী পর্য্যটকের অন্তরে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত করে তোলে। এইখানে কলিসিয়াম, এইখানে দেবতার প্রতি উৎসর্গীকৃত কুমারী ভেস্তাদের মন্দির; এইখানে জুলিয়স সিজারের সমাধি ও ভগ্নস্তূপ। এখানে মানবাত্মার ত্রাস ও পরিত্রাণের কাহিনীর কি বিপুল অভিনয় হয়েছে পৌত্তলিক ও খৃষ্টান আদর্শের সংঘর্ষের সময়ে। ঐতিহাসিক হিসাবে এতদূর সত্য নয়, তবু কলিসিয়মের হিংস্র প্রাণীর সঙ্গে যুদ্ধ বা তার

কাছে আত্মবিসর্জ্জনের কথা 'কাটাকুম্বে' এসে না মনে হয়ে পারে না। কর্ম্মকুশলতা যাদের ছিল বিশাল, নির্ম্মমতাও তাদের অমানুষিক। তাই মৃত্যুর পরও খৃষ্টানের নিস্তার ছিল না। তাদের কবর হত এই তথাকথিত মন্দিরগুলির প্রাচীরগাত্রের গোপনতায়।

নিষ্ঠুরতা ও যন্ত্রণাকে রূপ দিতে পারার কৌশলে বোধ হয় ল্যাটিন জাতি অতুলনীয়। ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়েছেন যারা তাঁদের অন্তরের অনুভূতি নয়, বাহিরের বেদনাই যেন বড় কথা। মিলানের মন্দিরে সেণ্ট বার্থোলোমিউর



মুমূর্ষু Gaul

জীবন্তে চর্ম্মহীন করে হত্যা করার একটী বীভৎস ও বিখ্যাত মূর্ত্তি আছে; আর এটীই সেখানকার অন্যতম দ্রষ্টব্য। ভ্যাটিকানে সিষ্টাইন চ্যাপেলে মাইকেল এঞ্জেলোর অতুলনীয় ফ্রেস্কোচিত্র "শেষ বিচার"; ভাস্কর্য্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ লাওকুন, য়্যাপেলোর অনুপম সৌন্দর্য্য, এ সব দেখে যত আনন্দ পাওয়া যায় তা সব ম্লান করে দিতে পারে এমনি ভীষণ একটী 'ট্যাপেষ্ট্রী' চিত্র

আছে ; এক মাইলের অষ্টাংশ ভাগ দীর্ঘ এই বিরাট্ চিত্রে নিরীহদের হত্যা দেখান হয়েছে। সেণ্ট পিটার্সে'ও এমন কয়েকটী মোজায়েকের মূর্ত্তি আছে যার নির্ম্মাণ-কৌশল অসাধারণ কিন্তু যে-কোন বালককে বহুরাত্রির দুঃস্বপ্ন দিতে পারে।

কিন্তু বেদনাও যে কেমন করে পরম রমণীয় হয়ে উঠতে পারে তারও উদাহরণ পাই। বাণবিদ্ধ সিবাষ্টিয়ানের আননে যে মাধুর্য্য ও দীপ্তি তা ধরণীর ধূলাকে অতিক্রম করে স্বর্গের স্বপ্ন দেখতে প্রেরণা দিবে, আমাদের বিফলতার করুণ মুহূর্ত্তগুলিকে সার্থক ও সম্পূর্ণ করে তুলবে। প্যালাটাইন মিউজিয়মে মুমূর্ষু 'গলে'র যে মূর্ত্তি আছে তা আমাদের মনে ভয় উদ্রেক করে না; করুণা জাগায়; বিফল বীরত্বের শেষ পরিচ্ছেদ যে মৃত্যু তারই অব্যক্ত কাহিনীর মর্ম্মোদ্ঘাটন করে। দেহের প্রতিটী রেখা কী দৃঢ়তাব্যঞ্জক, মুখের যন্ত্রণাচিহ্ন ও কপালের কুঞ্চিত রেখাগুলি কী জীবন্ত; কিন্তু এ মৃত্যুতে বীভৎসতা নেই। যে জীবনকে বীরত্বের সঙ্গে ধারণ করা হয়েছে তাকে সমান বীর্য্যের সঙ্গে ত্যাগ করার মধ্যে যে মহত্ত্ব তাই আমরা এই মূর্ত্তিতে পাই।

সভ্যতার সঙ্গে নিষ্ঠুরতার এমন সংমিশ্রণ আর কোথাও হয়েছে কি না সন্দেহ। বিলাস কখনো বেদনার মর্ম্মকথা বুঝে না। ভোগ ও লালসা দুঃখ ও লাঞ্ছনার প্রতি কোন সহানুভূতি দেখায় না। অতিমাত্রায় বিলাসী ও আত্মপরায়ণ প্যাট্রিশিয়ান তুচ্ছ সামান্য মূল্যের ক্রীতদাস বা চিরদাসের পরিশ্রমের ফলের উপর জীবনধারণ করত; কাজেই নিজের দুঃখের শিক্ষা তার হয় নি। দুঃখ কিন্তু জীবনে বড় কম পায় নি_তাই বলে। বহিঃশত্রু আসে না বার বার রাজ্য জয় করতে; কিন্তু অভ্যন্তরের যে শত্রু সে হানা দেয় অহরহ। এই রোমের অল্প ভূখণ্ডের মধ্যে যত পরোপজীবী ছিল তার তুলনা এথেন্সেও ছিল না। এখানে যত ধনরাশি, বিলাস ও পাপাচার হয়েছে তার তুলনা মিলে না। এই কুবের ও ব্যাকাসের রাজত্বে জীবন ছিল সংশয়ময়; মৃত্যু চরণ ফেলত গোপনে অতর্কিতে। লুকাল্লাসের পিন্‌চো পাহাড়ে প্রমোদগৃহ

ও কারাকাল্লার স্নান-হর্ম্ম্য দুইই রোমান চরিত্রের বিশেষত্ব; কিন্তু নিষ্ঠুর ছিল এই বিলাস-নিকেতনগুলির আবহাওয়া। প্রমোদচঞ্চল চেলাঞ্চলের মৃদুবীজনে কত বসন্তসমীরণের কবোষ্ণ নিঃশ্বাস উড়ে যেত; আবার হয়ত ঈর্ষ্যাফেনিল ষড়যন্ত্রসংকুল ঐশ্বর্য্যপ্রবাহে ভাসমান কোন অভাগা সম্রাট্ বা অভাগিনী রাজ-প্রেয়সী গুপ্ত পথ দিয়ে সহসা মৃত্যু-নদের তটে নিক্ষিপ্ত হতেন। এই প্রাচীন রোমের বাতাসে কত উদ্দাম কামনা, কত উন্মত্ত সম্ভোগের জ্বালাময় শিখা আলোড়িত হয়েছে; এখনো তার দুয়েকটী স্পর্শ হঠাৎ এসে মনকে চঞ্চল করে দিয়ে যায়।

পৌরাণিক ফিনিক্স পাখীর মতই রোম নিজের চিতাভস্ম থেকেই নিজেকে আবার নবজীবন দিয়েছে। অহল্যা পাষাণী পুনর্জন্ম পেয়েছে মুসোলিনীর স্পর্শে ধন্য হয়ে। রোম একদিনে নির্ম্মাণ করা হয় নি; এবং আশ্চর্য্যের বিষয় পুরাতন রোম ও নূতন রোমে অস্তিত্বের জন্য কোন দ্বন্দ্ব নেই; অর্থাৎ যতই নূতন সৃষ্টি হোক না কেন, তা হচ্ছে শুধু প্রাচীর-প্রসার, প্রাচীন-সংহার নয়। সপ্তশৈলবেষ্টিত রোম সুদূরবিসর্পিত।

মুসোলিনী একজন প্রকৃত স্রষ্টা। রোমের বিশাল রাজপথ, যানবাহন-নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন উৎসধারা, প্রমোদকানন, আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, ইতালীর চোখের সামনে নূতন ভবিষ্যৎ স্বপ্ন, সবই তাঁর সৃষ্টি। ইতালীর মত দেশ, রোমের মত নগরে নূতন শিল্পকলার যে আবর্ত্তন হয়েছে তারজন্য তাঁকেই ধন্যবাদ দিতে হবে।

ফাসিষ্ট প্রদর্শনীগৃহে ফিউচারিষ্ট আর্টের যে নিদর্শন পাই তা মনকে বিমুগ্ধ করবেই। অথচ প্রাচীনের গৌরব ও দর্শনীয়তা রক্ষা করছেন তিনি সমান আগ্রহে; আগে এত সহজে ও সম্পূর্ণভাবে রোম দর্শন করা সম্ভব হত না। বিলুপ্ত সম্পদের শেষ ভগ্নপ্রায় স্মৃতিস্তম্ভগুলি তাঁরই চেষ্টার ফলে আরো বহুদিন দর্শকের উপভোগের বিষয় হয়ে রক্ষা পাবে। ইতালী যে আজ নূতন জগৎ জয় করতে ছুটেছে, মহাসমারোহে সাম্রাজ্যের রাজপথ (via del impero) নির্ম্মাণ করেছে, তার পিছনে বহু পরিমাণে আছে নবপ্রবুদ্ধ অতীতের গৌরব স্মৃতি।

পুরাতন রোমের ধ্বংসস্তূপের অপূর্ব্ব চিত্রপট হচ্ছে নূতন রোমের ক্যাপিটল প্রাসাদ। নবীন গরিমা প্রাচীনের মহিমাকে অন্তরাল করেনি, তার অন্তরায় হয় নি, তাকে সুন্দরতর সম্পূর্ণতর করে তুলেছে। এমন আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য অনুভব করতে হলে দেখতে হয়; দূর থেকে এমন বৈশিষ্ট্যময় বৈচিত্র্য কল্পনা করতে পারা যায় না।

এমনি সামঞ্জস্যময় চিত্রপট আছে নেপল্‌সে। উপসাগরের পারে নেপল্‌সের প্রশান্ত রূপ চিত্রার্পিতবৎ মনোহর; আরো পিছনে বিসুবিয়াসের অগ্নি-উদ্গিরণ; সম্মুখের অদূর আকাশপটের বিচিত্র বর্ণ-গৌরবের উপর বিসুয়াসের ধূম্রমালা ধূসর আচ্ছাদন টেনে দেয়। তবু আকাশের বর্ণসমুদ্র বিলোপ করতে পারে না। শুধু মনে করিয়ে দেয়

> "ওই যেথা জলে সন্ধ্যার কূলে
> দিনের চিতা"

দিনের চিতার এমন পরিপূর্ণ রূপ কোথাও দেখিনি।

বিসুবিয়াসের উদ্যত রোষ ও প্রচ্ছন্ন হুঙ্কারের সামনেই যে জাতি এত উৎসবে উৎফুল্ল ও বিলাসে লীন হতে পেরেছিল সে জাতির মেরুদণ্ডের প্রতি লোভ ও প্রশংসা না করে থাকা যায় না। জীবনকে ভোগ করবার ও ত্যাগ করবার ক্ষমতা তাদের ছিল অসাধারণ ভাবে। তাই অগ্নিগর্ভ গিরির পদতলে, তার ভ্রূভঙ্গীর সম্মুখেই পম্পি (পম্পেই) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে যুগের ভস্মাচ্ছাদন তুলে ফেলে সেই সহরকে আমাদের চোখের সামনে ধরা হয়েছে। আইসিসের মন্দির, রঙ্গনিকেতন (য়্যাম্ফিথিয়েটার), নাট্যকবির ভবন সবই দেখা যাবে। যে কুকুরটী যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গিয়েছিল ও যে রমণী সম্ভবত ললিত লাস্যে বহুজনের যৌবন-স্বপ্ন হয়ে উঠেছিল তাদের দুজনেরই অস্থি-কঙ্কাল অবিকৃত অবস্থায় দেখা যাবে। আর দেখা যাবে পৌরভবনগুলির চিত্রাঙ্কণ-কৌশলের বহুসুন্দর উদাহরণ।

কি সৌভাগ্য, আমার সামনে আজ বিসুবিয়াসের পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত

হয়েছে। বিপুল বজ্রনির্ঘোষ ও মুহুর্মুহুঃ ভূমিকম্পের মধ্যে আমার ইটালীয়ান গাইড ক্রেটারে নিয়ে যেতে কিছুতেই আজ রাজী নয়। এবং বাঙ্গালী জীবনে এমন য়্যাডভেঞ্চারের মুহূর্ত্ত দ্বিতীয়বার হয়ত আসবে না। ওই অগ্নিগর্ভের কত কাছে যাওয়া যায় তা আজ দেখতেই হবে। শুধু অনুল্লেখযোগ্য প্রাত্যহিক দিনযাপনের বাইরে একটু না হয় সাহসী হবার চেষ্টাই করা যাক্,

"ওরে, সাবধানী পথিক,
বারেক পথ ভুলে মর ফিরে।"

গাইড হাত চেপে ধরে বারণ করল, কিন্তু প্রচণ্ড শব্দে তার কথা কাণেও ঢুকল না, মনের ত কথাই নেই। গন্ধকের গন্ধে যতক্ষণ শ্বাস রাখা যায় ও উত্তাপে পা রাখা যায় ততক্ষণ সামনে এগিয়ে গেলাম। কিছুই আর দেখা গেল না; জীবনে এমন কোন বিষম বিপদ্ বা বিশাল কীর্ত্তিও করা হল না। তবু দুটী রুমালে জড়ান গলিত লাভাপ্রবাহের প্রস্তরীভূত পিণ্ডটীর দিকে তাকিয়ে কখনো একা বসে ভাবব যে, হিসাব ও সাবধানতাকুশল বাঙ্গালীজন্মেও একদিন সে সব উপেক্ষা করতে ছুটে গিয়েছিলাম।

'রোমা' সুরম্যা। তাকে রমণীয় রাখবার জন্য সমস্ত ইতালীকে ব্যয়ভার বহন করতে হয়। আমরা বিদেশীরা সে খবর রাখিনা বা রাখতে চাইও না; কিন্তু এমন সুন্দর প্রমোদকানন দিয়ে যদি চিত্রশালাকে সাজান হয় তাহলে করভারও বোধ হয় বহন করা যায়। বর্ঘিস প্রাসাদে ইতিহাসের "বর্ত্তমান" অধ্যায়ের ইতালীর গৌরবগুলি সাজান আছে চমৎকারভাবে। ক্যানোভার ভাস্কর্য্য-গৌরব পাওলিনার অর্দ্ধশয়ানা মূর্ত্তি চোখে স্বপ্নের আবেশ লাগিয়ে দিল। পাওলিনা যখন এই মূর্ত্তির জন্য "বসেছিলেন" মডেল হয়ে তখন দাদা নেপোলিয়ন তার প্রায় বসনহীনতার জন্য শিউরে উঠেছিলেন; ভগিনী তার উত্তরে বললেন যে, তোমার ভাবতে হবে না, ঘরে যথেষ্ট উত্তাপ আছে। ব্যবহারিক জগতের নয়, প্রতিভার উত্তাপের মাদকতা এখনো অনুভব করতে পারি। ইতালীর শিল্পীদের কথা আজন্ম শুনে ও জেনে এসেছি। ইয়োরোপ বলতে

ত কিছু চিত্র মনে জেগে উঠেছে তার মধ্যে ইতালীর এদের চিত্রই সবচেয়ে বেশী। কিন্তু আরো একটী এবার যোগ হল। ভাস্কর বার্ণিনি-কে নূতন করে জানলাম। তার 'ডেভিড' মূর্ত্তির সহজ সংহতি মনকে অভিভূত করল। মনে মনে বললাম বার্ণিনি একান্তভাবে আমারই আবিষ্কার।

ক্যাপিটলাইন হিলের ধ্বংসস্তূপে বসে কত কি ভাবছি তার ইয়ত্তা নেই। ভাষায় যার আভাস দেওয়া যায় না, মুখ যার প্রকাশের বেলা মৌন হয়ে যায়, সেই ইতালিয়ানের জাতিগত বিশেষত্ব মধুর কিছু না করার (dolce far niente) ভাবে দেহ বিভোর, কিন্তু মন মুখর হয়ে উঠেছে। কি অতীতে, কি বর্ত্তমানে বিলাস ও বীর্য্য এ জাতিতে সমানভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সারা দেশ জুড়ে সামরিকতার আড়ম্বর অথচ হ্রদগুলি কেমন পত্রপল্লবশোভায় মাধুরী-মণ্ডিত স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্যে শান্তি বিতরণ করছে। রোমের মধ্যেই ক্যাপিটলের সম্মুখভাগে বিরাট্ ফাসিষ্ট শোভাযাত্রা এইমাত্র হয়ে গেল; আর পিছন দিকে কি সৌম্য শান্তি। সম্মুখের সঙ্গে পশ্চাতের যেন কোন সম্বন্ধই নেই; অথচ সামঞ্জস্যেরও অভাব দেখছি না। এই বৈচিত্র্যই রোমের বৈশিষ্ট্য। এর একপ্রান্তে ভার্জিলের কবিতা, অন্যপ্রান্তে সিসিরোর বাগ্মিতা; একদিকে নীরো, অন্যদিকে মার্কাস অরেলিয়াস; একধারে শৌর্য্য, অন্যধারে বিলাস; একযুগে সাধনা, অন্যযুগে ভোগ। এই সব মিলিয়ে রোমের ভগ্নাবশেষ। ঐতিহাসিকের শিক্ষা, শিল্পীর চক্ষু ও ভাবুকের প্রেরণা না থাকলে রোমের অন্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা বৃথা। বর্ঘিস প্রাসাদে বার্ণিনির একটী ভাস্কর্য্যের কথা মনে পড়ে। য়্যাপোলো প্রজারপিনাকে অনুসরণ করেছেন তাকে ধরবার জন্য; কিন্তু যেই এক একটী অঙ্গ স্পর্শ করছেন অমনি সেই অঙ্গ বৃক্ষলতায় পরিণত হয়ে সব স্পর্শকেই বিফল করে দিচ্ছে। সেই অপ্রাপণীয়া প্রজারপিনার মতই অবর্ণনীয়া রোমা।

সভ্যতা থেকে একটা পরিপূর্ণ দিনের নির্ব্বাসন। মিডেলবুর্গের দুধমাখনের হাটে ঘুরে বেড়াচ্ছি সম্পূর্ণ অকারণে। বাজারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই; কিছু সুতি ও রেশমী কাপড়, পুতির মালা, রবার ও কাঁচের খেলনা, কুটীরশিল্পের কিছু সম্ভার, দুধ মাখন ডিম আর মাছ। গারো পাহাড়ের তলার কোন হাটকে অনেকটা বড় অবস্থাপন্ন আর একটু রঙীন অর্থাৎ ইয়োরোপীয় করে দেখলেই বুঝা যাবে। দরদাম করা চলছে রীতিমত। চকোলেটের চালাঘরে ছেলে-মেয়ের ভীড়। দুধমাখনের লোভনীয় গন্ধে আকৃষ্ট হয়েই কি এই ননীচোর রাখাল বালকবালিকারা এসেছে ভীড় করে?

তা নয়। আজ হচ্ছে এই ডাচ্ গ্রামটীর উৎসবের দিন। এরা সকালবেলা গীর্জ্জায় গিয়েছিল, এখন এসেছে বাজারে, শুধু বেড়াতে আর মে মাসের রমণীয় রৌদ্রের উত্তাপ উপভোগ করতে। ছেলেমেয়েদের পরণে কালো পোষাক; মাথায় শাদা এক রকম টুপী; হাতে সাজি; পায়ে কাঠের নৌকার মত জুতা। এই হচ্ছে এদের উৎসবের বেশ। আধুনিকতম সূক্ষ্ম বিরলবাসের আকর্ষণ নয়, প্রাচীন শোভন বিচিত্র সজ্জার আবেদনই এদের কাছে বড় হয়ে উঠেছে আনন্দের দিনটীতে। সরল হাসিমাখা মুখে এদের কোন অভাব-অভিযোগের ছাপ নেই। পরস্পরের হাতের ভিতর হাত মালার মত গেঁথে নিয়ে সাজি দুলিয়ে আনন্দের প্রভাতী আলো ছড়াতে ছড়াতে ভিন্ন ভিন্ন সারিতে চলে যাচ্ছে। ওরা যেন প্রত্যেকেই এক একটী বিধাতার নিজ হাতে তৈরী করা ফুল এই মধুর প্রভাতের সব কিছু কমনীয়তার মধ্যে থেকে সব কিছুতেই পরিপূর্ণতা দান করছে। নিজে আর ওই বয়সের অম্লান আনন্দের মধ্যে ফিরে যেতে পারব না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস রোধ করলাম।

সেদিন সন্ধ্যায় বেলজিয়ামে আসবার ট্রেণ ধরতে ইচ্ছা হল না কিছুতেই। একটা নামহীন অখ্যাত ওলন্দাজ ধীবরপল্লী আমায় আকর্ষণ করল। সমুদ্রের নোণা গন্ধ আর মাছের মিশান গন্ধ আর কখনো হয়ত এমন সহজভাবে নিতে ইচ্ছা হবে না; কিন্তু সেই আঁধার রাতের বিজাতীয় বন্ধুদের সাহচর্য্যে সবই ভাল লাগল। পা ছড়িয়ে বসে তাদের সরল অথচ কঠিন জীবনযাত্রার কাহিনী শোনা গেল; ট্রলার কেন, বড় নৌকাতেই তারা সমুদ্র থেকে মাছ ধরে আনতে পারে। দল বেঁধে তারা বের হবে নৈশ অভিযানে রত্নাকরের কাছ থেকে শুধু মৎস্য আহরণের জন্য। কি সরল উদার মন এদের, যদিও এরা এই সমুদ্রের ওপারে কি আছে তা না জেনে নিজেদের তটভূমিটুকুর সংকীর্ণতাতেই সন্তুষ্ট হয়ে আছে। জলপথে এদের বিজয়-অভিযান অবারিত। কখনো কখনো প্রতিকূল আবহাওয়ায় বহু দূরে বা বিপথে চলে গেলে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাদের ফিরে আসার পথ চেয়ে তীরে অপেক্ষা করবে। বৃদ্ধরা শোনাবে তাদের নিজেদের অতীত বিপদ্ ও বীরত্বের কাহিনী, আর মায়েরা শিশুদের ছেলেভুলানো ছড়া শুনাবে স্বামীদের কীর্ত্তিকাহিনী তৈরী করে। যেদিন ঝড় খুব বেশী হয় সেদিন অভ্যস্ত হলেও তীরে দাঁড়িয়ে কত শঙ্কিত উৎকণ্ঠিত বক্ষের দুরুদুরু কম্পন। আমি তাদের বাংলার পল্লীবধূদের জলে প্রদীপ ভাসিয়ে সৌভাগ্যগণনার কথা বললাম। তারা মুগ্ধ হয়ে শুনল, আর আরো অনেক কথা জানতে উৎসুক হল। কিন্তু আজ ত আমি নিজেদের কথা শোনাতে আসিনি; এসেছি এদের কথা শুনতে, এক রাত্রির জন্য শিক্ষা ও সভ্যতার সুলভ অভিমান ভুলতে; জীবনকে সহজ সরল করে অনুভব করতে।

পৃথিবীর এই ভূমিখণ্ডে মাত্র ত্রিশ চল্লিশ মাইল দূরে সমুদ্রের পশ্চিম পারের আধুনিকতা থেকে পরিপূর্ণ বিরাম পেলাম। হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের প্রায় সর্ব্বত্রই বিংশ শতাব্দীর বণিক্-সভ্যতার কথা ভুলে মধ্যযুগের আবহাওয়ায় প্রাচীন অথচ আধুনিক সহরগুলিতে ঘুরে বেড়াতে পারি। ঘেণ্ট সহর

ইউরোপের একটি বাণিজ্যকেন্দ্র; তবু সে কথা চিহ্নহীনভাবে ভুলে নিশ্চিন্ত মনে মধ্যযুগের শিখরকণ্টকিত দুর্গগুলির মধ্যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারি। সহরের কেন্দ্রস্থলে একটা রাজপথেই সাতশত গজের মধ্যে সাতটি এমন দ্রষ্টব্য স্মৃতিস্তম্ভ আছে যা মনকে ইতিহাসের পাতার ভিতর দিয়ে কত পিছনে নিয়ে যায়। মনে পড়ে ক্রুসেডের কথা। এমনি একটা ক্রুসেড যোদ্ধা কাউণ্টের দুর্গের ভিতর বা জেরার্ড দস্যুর হৃৎকম্প সৃষ্টি করবার মত ভীষণ প্রাসাদের ভিতর এলে আর মনে হবে না যে ঠিক বাহিরেই ব্যস্ত জনাকীর্ণ ধূলিধূসরিত রাজপথটি শেয়ার বাজারের বিচিত্র চঞ্চল গতির কথায় স্পন্দিত হয়ে উঠছে।

আরো একটু দূরে দুটি সন্ন্যাসিনীদের মঠ। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে এই দুটি উচ্চ প্রাচীর দিয়ে বাকী সহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বর্ত্তমান যুগের বিশাল সহরের মধ্যেই মধ্যযুগের একটা ছোট সহররূপে মধ্যমণির মত বিরাজ করছে। তাদের পথগুলি সংকীর্ণ, একে বেঁকে গেছে; বাড়ীগুলি বিচিত্র, আর প্রাচীন পন্থী পোষাকে নম্র শত শত সন্ন্যাসিনী দীনভাবে দিন কাটাচ্ছেন প্রার্থনার মধ্যে। তাঁদের একজন তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন ও একটি প্রার্থনা দিয়ে আমার উপস্থিতি পবিত্র হল। সেই আসবাবহীন সামান্য উপকরণের ঘরটির অধিবাসিনী এ জগতের নয়, তাঁর আবাস ও বহির্ব্বাস, জীবিকা ও জীবন পৃথিবী থেকে সরিয়ে এনেছেন; এমন কি হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের অপরিহার্য্য ধূলির প্রাচুর্য্যও এখানে প্রবেশ করে না।

দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত সেণ্ট বাভোঁর গীর্জ্জায় অজ্ঞাতসারে আবিষ্কার করলাম ফ্লেমিশ চিত্রশিল্প ধারার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ভ্যান ডাইক ভ্রাতৃদ্বয়ের "রহস্যময় মেষের সম্বর্দ্ধনা"। আর একটি মজার জিনিষ জানা গেল। জন অফ গণ্টের জন্ম হয়েছিল এখানেই যদিও শেক্সপীয়রই তাকে প্রকৃতপক্ষে জন্ম দিয়েছেন আমাদের কাছে।

তাই বলে আধুনিকতারও অভাব নেই বেলজিয়ামে। ব্রুসেল্‌স্ ত একটা ছোটখাট প্যারিস, ওই একই রকম আমোদ প্রমোদ, রাজপ্রাসাদ, বুলভার,

কাফে, যায় ভাষা পর্য্যন্ত। সভ্যতার বিকাশের দিক্ দিয়ে ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে যে তারতম্যতা এ দুটি দেশের রাজধানীতেও পাওয়া যাবে। ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন, চারুশিল্পের প্রসার, সৌখীন জিনিষের ব্যবসা সবেই প্যারিসের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ, অনুকরণ নয়, বলে মনে হয়। অনুকরণ শুধু মনে হয় সহরটির গঠনপ্রণালী, আধুনিক শিল্পরুচি ও অধিবাসীদের নাগরিকতায়। যদিও এদেশে ফ্লেমিশ ও ফরাসী দুই ভাষাই চলে, রাজধানী সভ্যতার সভ্যতর ভাষাটিকেই পরিপাটিভাবে গ্রহণ করেছে।

কেবল একটি বিশেষত্ব একে বেলজিয়ম জাতীয়তার অভ্রান্ত অসংশয় চিহ্ন দিয়ে রেখেছে। নেদারল্যাণ্ড্সে দুটি জিনিষ জাতীয়তা-গঠনে মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল, একটি হচ্ছে গিল্ড হাউস অর্থাৎ বণিক্-সভাগৃহ ও অপরটি টাউনহল অর্থাৎ পৌরগৃহ। প্রথমটি বাণিজ্যের ও দ্বিতীয়টি রাজ্যপরিচালনার অনুষ্ঠান ছিল। প্রতি বেলজ সহরে এ দুটি থাকবেই এবং এদের গৃহশিল্পের ধারা এই সৌধগুলির মধ্যেই উন্নতি লাভ করেছে। ঘেণ্টের স্কিপার্স হাউস এদেশের গথিক শিল্পের সব চেয়ে সুন্দর বণিক্-সভাগৃহ। প্রত্যেক পৌরগৃহের সঙ্গে ইতিহাসের স্মৃতি বিজড়িত। ব্রুসেলসের গৃহটিতে ও সামনের "গ্রাঁদ প্লাসে" এদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রথম ভাগের ও স্পেনের সঙ্গে সংঘর্ষের কয়েকটী করুণ কাহিনীর স্মৃতি আছে।

বেলজিয়ানরা প্রধানতঃ ধর্ম্মপ্রাণ। এদের স্বাধীনতা-যুদ্ধও আরম্ভ হয়েছিল অনেকটা ধর্ম্মকে উপলক্ষ্য করেই। কিন্তু এত নীরবে ধর্ম্ম তার আসন প্রতিষ্ঠা করেছে যে চমৎকৃত না হয়ে পারি না। এরা ব্যবসা-বাণিজ্যে বেশ অগ্রসর কিন্তু মন কৃত্রিম হয়ে যায় নি। আর মধ্যযুগের আবহাওয়া নষ্ট না হয়ে যাওয়ায় ধর্ম্ম ও আধুনিকতাকে পরস্পরবিরোধী মনে হয় না এদের জীবনে। এদেশের ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল 'মালিনে'তে এই কথাই মনে হল। নীরব ধর্ম্মচর্চ্চার ফলে ধর্ম্মপ্রাণতা এত ব্যাপক, তবু রাষ্ট্র ও ধর্ম্মে কোন সংঘর্ষ হয়নি।

"হোলি ব্লডে"র শোভাযাত্রা বোধ হয় ইয়োরোপের সবচেয়ে বিখ্যাত

ধর্ম্মের শোভাযাত্রা। সব জায়গা থেকে ২রা মের পরের প্রথম সোমবার ক্যাথলিকরা তীর্থ করতে আসে ও "আমাদের অশ্বারোহী প্রভু"র রক্তের স্মারককে সম্মান দেখিয়ে যায়। শোভাযাত্রার প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে বাইবেলের কাহিনীগুলি বর্ণনা ও অভিনয় করা হয়। পুরাতন টেষ্টামেণ্ট থেকে নেওয়া হয় খ্রীষ্টের যন্ত্রণার ও নূতন টেষ্টামেণ্ট থেকে তাঁর জীবনের কাহিনী। তারপর হয় ফ্লাণ্ডাসে র কাউণ্টের সমারোহে প্রবেশ এবং তারপর বিশপদের পিছনে পিছনে ও নাগরিক পিতাদের ও "মহাশোণিতের ধর্ম্ম-ভ্রাতা"দের সামনে স্বুবর্ণপাত্রে সেই পবিত্র রক্তের চিহ্নের প্রবেশ। দুটী ঘণ্টা লাগে এই শোভাযাত্রার অতিক্রম করতে। চারদিক্ থেকে ঘণ্টাধ্বনি হয় ও বিশপ রক্তচিহ্ন দেখিতে নতজানু জনতাকে আশীর্ব্বাদ করেন। আবার সেই ক্রুসেডের কথা এসে পড়ে। দ্বিতীয় ক্রুসেডে বিশেষ বীরত্বের নিদর্শনস্বরূপ ফ্লাণ্ডাসে র কাউণ্ট এই রক্তের স্মারকটী জেরুসালেমে উপহার পেয়েছিলেন। তিনি সেটী ব্রুজ সহরকে দান করেন ও ম্যাজিষ্ট্রেটসংঘ সেটী এ পর্য্যন্ত শ্রদ্ধাভরে সাধারণের জন্যই রক্ষা করে আসছেন। এদেশে না ছিল ধর্ম্মান্ধতা, না ধর্ম্মের নামে ব্যবসায়পরায়ণতা।

উত্তর দেশের এই ভেনিসকে মধ্যযুগের স্রোত ভেনিসের খালের মতই ঘিরে রেখেছে। যদিও এই ব্রুজে আজ অনেক পরিবর্ত্তন হচ্ছে, তার খালের জলপথে ঘেরা প্রাসাদ ও মন্দিরগুলি দেখবার জন্য আধুনিকদের আগমন ও দেখাবার জন্য আধুনিক উপায়ে চেষ্টা করা হচ্ছে তবু ব্রুজ এখনো মধ্যযুগ পেরিয়ে বর্ত্তমানে এসে পৌছায় নি। বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতীক গত মহাযুদ্ধের অগ্নিশিখা একেও স্পর্শ করেছিল ; এখান থেকে বাসে করেই ইপ্ র্ (বৃটিশ টমির বিখ্যাত 'ওয়াইপারস') ডিক্সমুড, নিউপোর্ট প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরে আসা যায়। মরণলীলার সেই মহাশ্মশানগুলিতে 'ট্রেঞ্চ'গুলি এমনভাবে এখনো সাজানো আছে যে, সেই সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গপথে মাটির নীচের নামমাত্র আশ্রয়স্থলে বা চোরা কুঠুরীতে ঘুরতে ঘুরতে গা ছম্ছম করে ওঠে ; ভয় হয়

যে, এখনি কোন সঙ্গীনধারী শত্রুসৈনিক বিরাট্ গালপাট্টায় অট্টহাস্য করে আমারি অবস্থা সঙ্গীন করে তুলবে। এত কাছে এই যুদ্ধক্ষেত্রগুলি। তবু ব্রুজের প্রাণকে তারা স্পর্শ করতে পারেনি। বর্ত্তমানের চঞ্চল উদ্দাম জীবন-যাত্রার ঢেউ ব্রুজের খালগুলিতে এসে পৌছায় নি। এ যুগের গৃহশিল্প এখানে নেই, নেই বিশাল মসৃণ ম্যাকাডামের রাজপথ। সংকীর্ণ গলিপথের দুধারে অনুচ্চ প্রাচীন গৃহদ্বারে প্রাচীনারা লেসের কাজ করে যায়—তাদের সামনের প্রস্তরবন্ধুর পথে বিদেশী উৎসুক আধুনিকদের একেবারে উপেক্ষা করে। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে আজ পর্য্যন্ত belfryর চূড়ার carillonএর কাঠের ডাণ্ডায় হার্মোনিয়ামের রীডের মত ঠুকে ঠুকে ঘণ্টা বাজিয়ে নানা বিদেশী সুরের ঐক্যতান বাদনের মধ্যে ব্রুজ সন্ধ্যাবেলা ঘুমিয়ে পড়ে। সারা রাত্রির ‘বল’ নৃত্যের চটুল চরণাঘাতে তার নিদ্রাভঙ্গ হয় না।

পশ্চিমে সমুদ্রতীরে অষ্টেণ্ডের নৃত্য ও জুয়ার তীর্থ কুর্সাআলের সামনের বাসবিরল সমুদ্রস্নানের বালু-বেলাতেও ব্রুজে শোনা সেই সুরের ধুয়াটি কাণে বাজছে—

Somewhere a voice is calling.

স্বর্গ হইতে বিদায়

"ম্লান হয়ে এল কণ্ঠে মন্দারমালিকা।" আমার কৈশোর কল্পনার স্বর্গ থেকে বিদায় নেবার সময় এল। নিশান্তের সুখস্বপ্ন সম তিনটী বৎসর। খুব বেশী দিন নয়। অথচ যেন একটী জন্মান্তরের ওপার থেকে পূর্ব্ব দিগন্তের অরুণোদয়ের দিকে প্রথম তাকাচ্ছি। আর অন্তরের মধ্যে রয়েছে একটা করুণ নিস্তব্ধতা। তাই এখন নিজের মনের হিসাব খতিয়ে দেখার সময় এল।

মনে পড়ছে, কমলা-সৌরভমদির ভ্যালেন্সিয়ার বালুবেলায় বসে পূর্ণিমা রাত্রিতে পূর্ব্বমুখ হয়ে নীল ভূমধ্যসাগরে একটী ফুল ভাসিয়ে দিয়েছিলাম দেশকে উৎসর্গ করে। মনে পড়ছে, স্বপ্নে একবার আকুলভাবে সমুদ্রপথে পাড়ি দিয়েছিলাম পদব্রজেই, আর এক একটী পদক্ষেপের সঙ্গে একটী করে পদ্মফুল জলের মধ্যে জেগে উঠেছিল; সে স্বপ্ন দেশের মাটীতে পদস্পর্শের সঙ্গেই ভেঙ্গে গিয়েছিল। এখন দেশে ফিরবার সময় সে আকুলতার সঙ্গে উদ্বেগ মিশে যাচ্ছে। এতদিনে না জানি কত বদলিয়ে গিয়েছি, অথচ দেশ যদি অভিমানভরে তা না বুঝতে চায়? কিন্তু আমাকে বদলাতে যে হবেই। ইয়োরোপের বিচিত্র বহুমুখী প্রাণের সঙ্গে সংস্পর্শে এসেও যদি কেহ না বদলায় তাকে জড়পদার্থ বলতে হবে। ইয়োরোপ কেন, শুধু ভারতবর্ষেই যদি থাকতাম তবু নব নব ভাবসংঘাতে পড়ে কত বদলিয়ে যেতাম তার ঠিক নেই, অথচ প্রত্যহের দেখা সেই পরিবর্ত্তন কারো চোখে ঠেকত না। কোন ভাবধারাই এই ব্যবধানলোপকারী পরস্পরের সংযোগময় যুগে ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। আর সেই ভাবের আবর্ত্তের মধ্য থেকে বহুদিন পরে যখন হঠাৎ উঠে আসব তখন সবাই সবিস্ময়ে তাকাবে। তার চেয়ে মর্ম্মান্তিক হবে যদি কেহ বলে—"আহা! কি সুদৃষ্টান্ত দেশে ফিরে এল বিদেশ থেকে;

একটুও বদলায় নি।" এই ধরণের কথা হবে প্রকারান্তরে গতিশীল মনের অপমান। যা আমার হয়েছে তা ত পরিবর্ত্তন নয়, তা পরিণতি। জীবন ধরেই যেন এই পরিণতির ক্রমবিকাশ হতে থাকে।

দেশে ফিরে আসব, কিন্তু শকুন্তলার তপোবনবাস ত্যাগকালের মত বিচ্ছেদ-বিহ্বল পিছুটান কি পদে পদে অনুভব করব না? মনে পড়বে না আমার এই ক্ষণিকের কুটীরটীকে? তার বাতায়নটীকে, যার ভিতর দিয়ে বিরাট্ লণ্ডনের দূর কোলাহল তরীর তলে ছলছল শব্দের মত অস্পষ্টভাবে ভেসে আসত, আর নীচের পথচারী পথচারিণীদের উল্লাসময় শোভাযাত্রা দেখে তাদের জীবনকে কল্পনায় কাব্য মনে করতাম, যার ভিতর দিয়ে আসন্ন শীতের ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতর দিনগুলি আমার কক্ষকোণে আলোকের সুদীর্ঘ স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছে, যার ভিতর থেকে দেখতে পাচ্ছি এ চিন্তাহীন প্রবাসের কত নব পরিচয়সুখ নব নব বিস্ময়ের দান দিগন্তের বর্ণম্লানিমায় শরতের শেষ রশ্মিরেখার মত করুণ অবসান লাভ করে যাবে? মনে কি পড়বে না সে দিনগুলির কথা যখন আশায় সফলতায় কর্ম্মভারে সার্থক দিনগুলির শেষে অগ্নি-উদ্ভাসিত আমার ঘরটীতে শুভ্র লাইলাক গুচ্ছের তলে মুখ রেখে বসে নীরবে আত্ম-উপলব্ধি করতাম?

কিন্তু ইয়োরোপের মনে শান্তি নেই। তার সমৃদ্ধি আছে, সংহতি নেই; শক্তি আছে, কিন্তু শান্তি নেই। অহরহ পরিবর্ত্তন, নিত্য নূতনের অভিষেক। সেই ইংরেজী গানটার কথা মনে পড়ে, **Paris, stay the same**। কিন্তু পারী কি সেই থাকবার পাত্রী? ইয়োরোপ ত ধ্যানমগ্ন আত্মসমাহিত অপরি-বর্ত্তনীয় ভারতবর্ষ নয়, তাকে পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভেসে চলতেই হবে। নব নব বিকাশের পথে তার গতি, তার ভবিষ্যৎ পরিণতি ত বর্ত্তমানেই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

যে অফুরন্ত জীবনোৎসব দেখেছি শুধু তাই ইয়োরোপের শেষ কথা নয়। তার অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন আছে মরণোৎসবের বীজ। নটরাজের এই চিন্তাহীন উদ্দেশ্যহীন অকারণ পুলকে নৃত্যের মধ্যে শুধু জীবনের নয়, মরণের ছন্দও

বাজে। গত মহাযুদ্ধের সময় সে ছন্দ জেগে উঠেছিল; আবার যে কোন সময় তা জাগতে পারে।* সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি ও সংহার দুইয়েরই লীলা ইয়োরোপে হচ্ছে প্রচুর। আমাদের দেশের উপর বুঝি পড়েছে স্থিতির ভার। তাই সে শতাব্দীর পর শতাব্দী আত্মসমাহিত হয়ে একই ভাবে রয়ে যাচ্ছে পশ্চিমের চির চঞ্চলতা থেকে অনেক দূরে, যদিও সে চঞ্চলতা ও পরিবর্ত্তনের ঢেউ প্রাচীকে কম আঘাত করছে না। একটী বিশেষণে একটী মহাদেশের সম্যক্ পরিচয় হওয়া অসম্ভব, যদি সম্ভব হত তাহলে ইয়োরোপকে বলতাম চির-নবীন। তার মানে এ নয় যে সে চিরকাল একই নবীনতার মধ্যে রয়েছে; যুগের পর যুগে তার বিভিন্ন রূপ; কালস্রোত কোন রূপ পুরাতন হবার আগেই তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ইয়োরোপকে আমার চেনা শেষ হল না। অনন্ত জীবনোৎসব ও আসন্ন মরণ-সমারোহের মাঝখানে যে প্রাণের বৈচিত্র্য তার কত চিত্রই এখনো বাকী রয়ে গেল। কিন্তু সবই কি শেষ করে দেখা যায়? নিজের মনকেই কি শেষ করে জেনেছি? সিন্ধুগামী তরঙ্গের মত জীবনস্রোত কত দেশের তট অনুভব করে, কত উপলবিষম বা সহানুভূতি-শ্যামল পথে ঘুরে ঘুরে চলবে নিরুদ্দেশ যাত্রায়। আবার যদি আমার কৈশোর-স্বপ্নের তীর্থে আসি, কত জিনিষ নূতন আবিষ্কার করব তার সীমা নেই। ইয়োরোপ এগিয়ে যাবে, আমার মনও যাবে এগিয়ে, কারণ এ দুইয়ের কেহই স্থাণু নয়। তাই আবার নিত্য নবীনের সঙ্গে হবে নব পরিচয়। এ ত শতদল পদ্ম নয়, এ যে নিত্যপ্রসারী প্রাণপুষ্প, তার প্রত্যেকটী দলের রূপ রস ও পরিচয় স্বতন্ত্র। সে বৈচিত্র্যের আশায় দিন গোণা—সেও ত কম কথা নয়।

তবু—তবু যতই মোহিনী হোক ইয়োরোপা, সে আমার নয়। আমার নিয়তি এখানে নেই, আছে আমার দেশে। এখানে যা পেলাম তা মনকে

* বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার বহুপূর্ব্বে লিখিত।

করেছে উর্ব্বর, তবু মনের উদ্ভব ত এখানে হয় নি। কাজেই যা পেলাম তা যদিও কম নয়, তা-ই সব নয়। আমার জীবনের পরিণতি এখানে হতে পারে না, এখানে কেহ আমার জন্য প্রার্থনা করবে না, সৌভাগ্য কামনা করে তুলসীতলায় সন্ধ্যাদীপ দিবে না; রবীন্দ্রনাথের শাপভ্রষ্টের 'স্বর্গ হইতে বিদায়ের' সময়ের মতই অশ্রুবাষ্পহীন হবে আমার প্রত্যাগমন। আর এপারে আমার দেশও আমাকে ছাড়িয়ে গেছে হয়ত অনেক দিক্ দিয়ে। সে যেমন আমায় পরীক্ষা করে নিবে তাকেও আমি নূতন আলোকে দেখতে পাব। যার মধ্যে জন্ম ও প্রথম জীবন যাপন করেছি তার মধ্যেই যে সব রূপ সব সত্য ও সব আশা নিহিত নেই এই জ্ঞানের আলোকে দেশকে দেখতে পাব। আর আমাদের মৃত্তিকার অনাদৃতা মাতার মমতা ও স্নিগ্ধহাসির মায়া ওপারের তীব্র আলোকদীপ্তিকে ধীরে ধীরে ঢেকে দিবে, তার অভাবকে সহনীয় ও ক্রমে সহজ করে তুলবে। আমার হবে রূপান্তর।

তবু ইয়োরোপের বিচ্ছেদব্যথা পদে পদে অনুভব করব। বিশেষ করে যখন গ্রামে ও গ্রাম্যসহরে দিনের পর দিন বৈচিত্র্যহীন জীবন-সরসীর শ্যামল শৈবালদলে জড়িয়ে যাব, এই আলোকোজ্জ্বল লীলাময় জীবনস্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে নিজের সত্তা ভুলে যাবার বিপুল বিরতি পাব না। পাব না আনন্দ-চঞ্চলতা ও অপরিসীম উৎসাহ, পাব না নিজেকে ভুলে নিজেকে বিশ্রাম দিতে। এমনই পথে ভীড় থাকবে, থাকবে মনে অনাড়ম্বর ভীরুতা, শুধু থাকবে না পরিচয়হীন ভেসে যাওয়ার সুখ। এমনই আমি থাকব, থাকবে আমার অনুভূতি-প্রবণ মন, শুধু পারিপার্শ্বিক যাবে পরিবর্ত্তিত হয়ে। আমার আমি হয়ত আড়ষ্ট হয়ে আসবে সংসারের প্রয়োজন, কৃত্রিমতা ও সহানুভূতি-হীনতার মলিন আবেষ্টনে। কিন্তু সত্যিই কি তা-ই হবে? জীবনের শ্রেষ্ঠ তিনটী প্রভাবান্বিত বৎসর ইয়োরোপে কাটালাম, তার তুলনা আর হবে কি না জানি না, আর সব ফিরে পেতে পারি কিন্তু সে সময়কে ফিরে পাব না যে সময়টুকুতে অসীমের শেষ সীমাভরা অমরাবতী এই ধরাতেই রচনা করলাম,

নিজের ব্যক্তিত্ববিকাশের যে সময়টুকু সকল প্রশ্ন, দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের ঊর্দ্ধে চলে গিয়ে আমার কল্পনায় জীবনের সঙ্গে প্রথম শুভদৃষ্টির মত হয়ে রইল। তার আনন্দ-আভাস প্রত্যহের দিনযাপনের গ্লানি ছাপিয়ে প্রভাতদীপ্তির মত জেগে থাকবে। মানি যে দেশের নিকষে বিদেশের অনেক সোণা হয়ত শুধু সোণালী বলেই প্রমাণিত হবে, তবু ইয়োরোপা হাতে যে মাধবী-কঙ্কণ চোখে যে রূপকজ্জল পরিয়ে দিয়েছে তা চিরদিনই অম্লান থাকবে।

আমার পূর্ব্বাচল পশ্চিমের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে রইল।

নিজের ব্যক্তিত্ববিকাশের যে সময়টুকু সকল প্রশ্ন, দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের ঊর্দ্ধে চলে গিয়ে আমার কল্পনায় জীবনের সঙ্গে প্রথম শুভদৃষ্টির মত হয়ে রইল। তার আনন্দ-আভাস প্রত্যহের দিনযাপনের গ্লানি ছাপিয়ে প্রভাতদীপ্তির মত জেগে থাকবে। মানি যে দেশের নিকষে বিদেশের অনেক সোণা হয়ত শুধু সোণালী বলেই প্রমাণিত হবে, তবু ইয়োরোপা হাতে যে মাধবী-কঙ্কণ চোখে যে রূপকজ্জল পরিয়ে দিয়েছে তা চিরদিনই অম্লান থাকবে।

আমার পূর্ব্বাচল পশ্চিমের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে রইল।